সবার জন্য
সর্বশেষ বিজ্ঞান
৩

পরমাণু দিয়ে গড়া

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

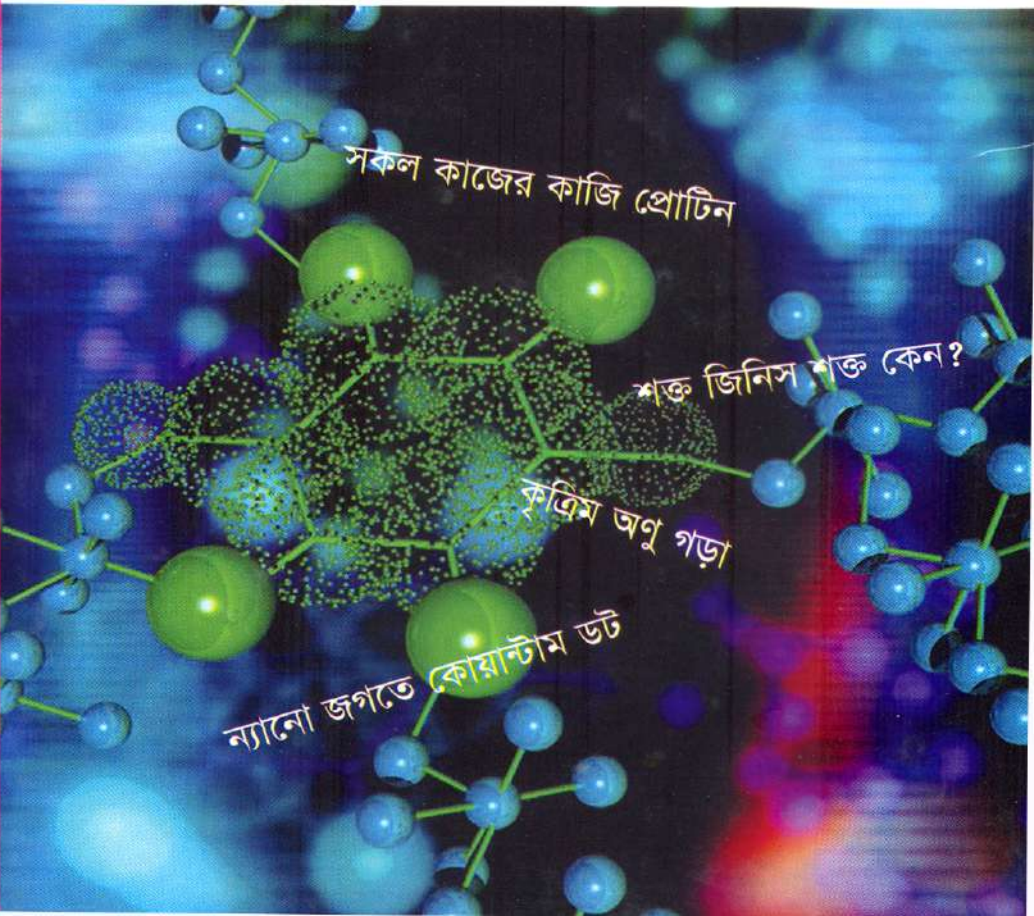

পরমাণুতে পরমাণুতে বন্ধন-বিচ্ছেদের কলাকৌশলের ভিত্তিতেই দাঁড়িয়েছে আজকের রসায়নবিদ্যা। পরমাণু দিয়ে গড়া জগতের সাম্প্রতিকতম বিভিন্ন দিককে সহজ ভাষায় তুলে ধরতে গিয়ে সেই রসায়নের একেবারে অ আ ক খ থেকে শুরু করেছে এই বই, যাতে বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও তার ভেতরে প্রবেশ করা যায়। রসায়নবিদরা আধুনিক জীবনের অনেক বস্তুকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করেছেন জটিল প্রাকৃতিক অণুর গঠনকে প্রথমে উদ্ঘাটন করে, এবং পরে তার অনুকরণে নিজেরা সেই অণু গড়ে। তাঁদের সে সাফল্য এখন জীবের দেহবস্তুতে পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছে। এই সব উদ্ঘাটন, এই সব সক্ষমতার কৌশলগুলো যেমন আমরা এ কাহিনীতে এনেছি, তেমনি এনেছি বাধাহীন বিদ্যুৎ পরিবাহী বস্তুর এবং ন্যানো প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ হাতছানিগুলো কেমন করে অণু-পরমাণুর সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে চলেছে সেই প্রক্রিয়াকেও।

প্রচ্ছদ চিত্র

অণুর গঠন চিত্রের ত্রিমাত্রিক মডেল

পরমাণু দিয়ে গড়া

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

পরমাণু দিয়ে গড়া

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

উৎসর্গ

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের (সিএমইএস) ব্যাপক
কর্মযজ্ঞে যারা সর্বক্ষণ নিজেদেরকে
নিয়োজিত রেখেছে তাদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

আধুনিক রসায়নবিদ্যার শুরু থেকে বিজ্ঞানীরা পরমাণুর ভিত্তিতে নানা পদার্থকে দেখতে শুরু করেছেন, এবং পদার্থসমূহের মধ্যে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া তাকেও বিভিন্ন অণু-পরমাণুর মাঝে বিক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল রসায়নের কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম, এবং পরমাণুর এ নিয়মে একত্র হয়ে অণু গঠনের ধারণা। রসায়নবিদ্যার এসব ভিত্তির কথা দিয়েই এই বইয়ের শুরু– যাতে বিজ্ঞানের ছাত্র যারা নয় তারাও বুঝতে পারে অণু-পরমাণু দিয়ে গড়া এই বিচিত্র জগতটাকে– শুধু জড় জগৎ নয়, জীব জগতও বটে। আধুনিক জীবনে আমরা নিত্য ব্যবহার্য নানা বস্তু থেকে জীবন রক্ষাকারী যে ওষুধ পাচ্ছি তার অনেকগুলোই রাসায়নিকভাবে সংশ্লেষিত হয়েছে। কী উপায়ে সম্ভব সেই সংশ্লেষণ? এসবের পেছনে মৌলিক ভাবে কাজ করেছে পদার্থবিদ্যার পরমাণু চিত্র, এবং পরমাণুতে পরমাণুতে বন্ধনের সুযোগ যা মূলত কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক। আর জটিল সব অণু, বিশেষ করে জৈব অণুগুলো সংশ্লেষণের আগে বুঝতে হয়েছে প্রকৃতিতে পাওয়া এবং সংশ্লেষণের নানা পর্যায়ে গড়া অণুগুলোর বিস্তারিত গঠন। শুধু কোন কোন পরমাণু তাতে আছে তা নয়, কী তাদের বন্ধন, কেমন আকৃতি নিয়ে সে বন্ধন– সব কিছু। এ জন্য আজকের রসায়নবিদের কাছে চমৎকার সব কৌশল ও যন্ত্রপাতি রয়েছে যা উদ্ভাবন করেছেন পদার্থবিদরা– এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফি, এন এম আর ইত্যাদি আরো বেশ কিছু। এগুলোর কাজ বুঝলে রসায়নবিদের কাজটিও আমাদের কাছে প্রাঞ্জল হয়ে আসে– সে চেষ্টাও নেয়া হয়েছে এই বইয়ে। জীবকে বুঝার চেষ্টা এক সময় শুধুই তাদের দেহ গঠন, আচার আচরণ বুঝার কাজেই বেশি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন প্রাণ-রসায়নের কল্যাণে আরো মৌলিক ভাবে জীবনের রহস্যভেদ সম্ভব হয়েছে– সকল কাজের কাজি প্রোটিনের উম্মোচনে, এবং জীবনের কোড ডিএনএর কাজ বুঝাতে পারার মাধ্যমে। এই বইয়ের আলোচনায় অণু উদ্ঘাটনের মাধ্যমে এসব কী ভাবে সম্ভব হয়েছে তা বুঝার চেষ্টা রয়েছে।

অন্যদিকে আমাদের বস্তুজগতের অনেকখানিই জুড়ে রয়েছে কঠিন পদার্থ ও তার ভৌত গুণাগুণ। এসব কিন্তু শুধু রসায়নের উপর নয়, ওর ক্রীষ্টালে অণুগুলোর কতটা কেমন শৃঙ্খলার সজ্জা ও ঠাসবুনোট রয়েছে তার উপরেও নির্ভর করে। আরো চমকপ্রদ ব্যাপার হলো এসব ওখানকার সূক্ষ্ম নানা ত্রুটির উপর নির্ভর করে অনেক বেশি। এই শেষোক্ত দিকটি অনুসরণ করে আমরা এই বইয়ে দেখেছি শক্ত জিনিস কেন শক্ত, সেমিকন্ডাক্টর বস্তু দিয়ে আধুনিক ইলেকট্রনিক জগৎ কীভাবে সম্ভব হলো, এবং সুপার কন্ডাক্টিভিটি বা অতিপরিবাহিতা কেমন করে কাজ করে। এ মুহূর্তে সব চেয়ে বেশি সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি অবশ্য দিচ্ছে ন্যানো-বিজ্ঞান ও ন্যানো-প্রযুক্তি। এগুলো রীতিমত অণু-পরমাণুর সাইজের যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, অতি ক্ষুদ্র কম্পিউটার যার এক একটিকে ধূলি কণার মত সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া যাবে, এমন সব জিনিস নিয়ে আসছে। ইতোমধ্যেই তার কিছু কিছু সম্ভব হয়েছে। কী করে অল্পকিছু অণুর গুচ্ছ তৈরি করে এমন সব নূতন কাণ্ড ঘটানো যাচ্ছে তাও এই বইয়ের উপজীব্য।

আধুনিক জীবন ও আধুনিক মননশীলতা গড়ে তুলছে বিজ্ঞানের যে সব দিক সেগুলোর কোন কোনটির সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের চেষ্টা আমরা করবো 'সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান' এই পুস্তক সিরিজের বিভিন্ন বইয়ে।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

অণুর ভাঙ্গা গড়া ১৩
অণু-গঠন নির্ণয়ে আধুনিক কৌশল ৩৮
কঠিন পদার্থ ৫০
জীবনের রসায়ন ৬৬
ন্যানো-বিজ্ঞান ও ন্যানো প্রযুক্তি ৭৬

পরমাণু দিয়ে গড়া

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

অণুর ভাঙ্গাগড়া

পরমাণু মিলে অণু

পরমাণুর ধারণা মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত– প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম রূপ হলো এর নিজস্ব ভিন্ন পরমাণু। কিন্তু সব পদার্থ মৌলিক পদার্থ নয় – একাধিক মৌলিক পদার্থ রাসায়নিক ভাবে একত্র হয়ে যৌগিক পদার্থ তৈরি করে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন প্রত্যেকে মৌলিক পদার্থ। কিন্তু এরা দুইয়ে মিলে পানি গঠন করে বলে পানি যৌগিক পদার্থ। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরমাণু রয়েছে। কিন্তু পানির পরমাণু নেই – তার রয়েছে অণু, যা কিনা পানির ক্ষুদ্রতম রূপ। এই অণু দুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু এবং একটি অক্সিজেনের অণু দিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে গঠিত। অণু একই পরমাণু দিয়েও গঠিত হতে পারে। অক্সিজেন মৌলিক পদার্থ হলেও অক্সিজেন গ্যাসের ক্ষুদ্রতম রূপ কিন্তু এর পরমাণু নয়, বরং দুটি অক্সিজেন পরমাণুর সমম্বয়ে তৈরি এর অণু।

কোন কোন পদার্থের এই অর্থে কোন অণুই নেই- এরা সরাসরি পরমাণু দিয়ে গঠিত– তা মৌলিক পদার্থ হলে একই রকম পরমাণু দিয়ে, আর যৌগিক পদার্থ হলে একাধিক রকমের পরমাণু দিয়ে– যদিও অণু গঠন না করেই। যেমন কঠিন লোহাতে লোহার পরমাণুগুলো স্ফটিকের আকারে সুন্দর সাজানো থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকটি কয়েকটি মিলে গুচ্ছ হয়ে অণু গঠনের কোন প্রবণতা থাকেনা। একে গলিয়ে তরল করলে তরলের মধ্যে লোহার পরমাণুগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে পাওয়া যাবে। বরফ গলিয়ে তরল পানি করলে কিন্তু তা হবেনা– অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো যার যার মত আলাদা হয়ে যাবেনা, বরং দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণুর গুচ্ছ অণু হিসেবেই তরলে ঘোরাফেরা করবে। খাবার লবণের স্ফটিকে

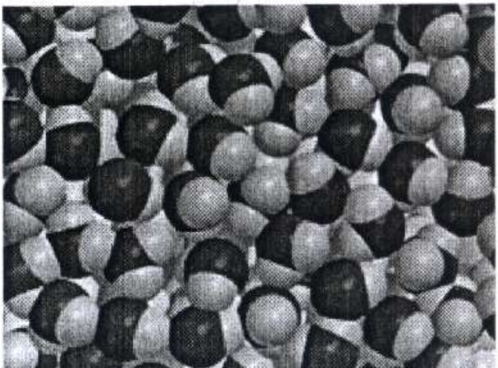

কঠিন অবস্থায় পানির অণু (বরফ)
কালো অংশটি একটি অক্সিজেন পরমাণু। তার সঙ্গে দুটি সাদা অংশ দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু।

সোডিয়াম আর ক্লোরিন দুটি পরমাণু পরপর সুশৃঙ্খল ভাবে সাজানো থাকে সেজন্যই এটি সোডিয়াম ক্লোরাইড। কিন্তু তাকে তরল করলে ঐ লোহার মতই সোডিয়াম আর ক্লোরিনের পরমাণুগুলো যার যার মত আলাদা হবে, ছোট ছোট

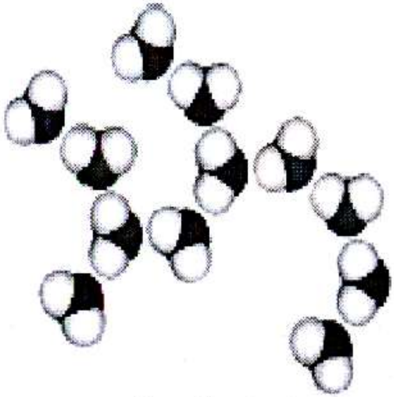

তরল পানিতে পানির অণুগুলো

গুচ্ছে লবণের অণু হিসেবে নয়। তরলের মধ্যে দ্রবণেও তাই হবে। এভাবে দেখা যায় সব বস্তু যে অণুতে গঠিত এ কথাটি জোর দিয়ে বলা যায়না।

কঠিন অবস্থায় সোডিয়াম ক্লোরাইড অণু

তবে মোটা দাগে বলা যায় যে ধাতব পদার্থগুলোকে (লোহা, তামা, দস্তা, সোডিয়াম ইত্যাদি) অণু হিসেবে পাওয়া যায়না। অধাতব পদার্থ প্রায়

জলীয় দ্রবণে সোডিয়াম ক্লোরাইড। তরল অবস্থায় এটি অণু থাকেনা।

সবগুলোকেই অণু হিসেবে পাওয়া যায়। যেমন মৌলিক পদার্থ ফসফরাস কঠিন অবস্থায় থাকা অবস্থায়ও এর চারটি পরমাণু এক গুচ্ছে থাকে, অণু গঠন করে; পানির মত যৌগিক পদার্থগুলো তো বটেই।

বস্তুজগতকে রাসায়নিকভাবে বুঝতে গেলে তার অণু গঠনের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আসে। অণুতে কী কী পরমাণু রয়েছে সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কী আকৃতি গঠন করে পরমাণুগুলো সেখানে রয়েছে অর্থাৎ অণুর আকার-আকৃতিগুলোও এতে বড় ভূমিকা পালন করে। এর আগের বইতে আমরা পরমাণু কত বড় তা দেখেছি। পানির অণুর মত ছোট একটি অণু বিবেচনা করলে সেটি যে পরমাণুর সেই আকারের চেয়ে অনেক বড় কিছু তা মোটেই নয়– কয়েকটি পরমাণু গায়ে গায়ে লেগে থাকলে যা জায়গা নেবে বড় জোর এতখানিই। আসলে এরকম একটি অণুর ব্যাস এক মিলিমিটারেরও প্রায় ৩০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এমন ক্ষুদ্র একটি জিনিস চোখে দেখার কোন সুযোগ নেই, এমনকি অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও নয়। তা হলে কোন কোন পরমাণু মিলে কী অণু গঠন করলো, কী তাদের আকার আকৃতি, তা আমরা জানলাম কী করে? আদৌ যে অণু গঠন করছে তাও বা বুঝলাম কী করে? এর উত্তর হলো তাত্ত্বিক বিবেচনায় হিসেব নিকেষ করেই আমরা এর সন্ধান পেয়েছি। রাসায়নিক ভাবে বস্তুগুলো যে রকম আচরণ করে তার থেকেই অণু সম্পর্কে এত কিছু জানা সম্ভব হয়েছে। অণুর ঐ তত্ত্বের সঙ্গে আচরণগুলো মিলে যায় বলে অণুর ঐ ছবি সঠিক বলে বিবেচিত হয়। বিজ্ঞান তো এ ভাবেই কাজ করে।

অবশ্য কিছুটা পরোক্ষভাবে পরীক্ষণেও অণুর আকৃতি ইত্যাদি নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। যেমন এই অণুর সমন্বয়ে যদি কোন ক্রীষ্টাল বা স্ফটিক গড়ে উঠে এখন

ঐ স্ফটিকের নানা স্তর থেকে এক্সরে কী ভাবে প্রতিফলিত হয় তার কোণগুলো এবং প্রতিফলিত এক্সরে'র তীব্রতার মাপজোক থেকে হিসেব করে অণুর আকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব। এক একটি পদার্থের জটিলতর অণুর গঠন, আকৃতি ইত্যাদি জানতে এই পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে।

আর কিছুটা আবছা ভাবে হলেও একেবারে সরাসরি অণু দেখার মত প্রযুক্তিও এখন আবিষ্কৃত হয়েছে; কোন কোন ক্ষেত্রে সেটিও সহায়ক হয়েছে। আগের বইয়ে দেখেছি স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপির (এসটিএম) সাহায্যে পরমাণু কীভাবে দেখা যায়। এতে সীমিত ভাবে অণুর গঠনও দেখা যায়। তবে আসলে অণুর জগতকে আমরা উদ্ঘাটন করেছি এ সম্পর্কে তত্ত্ব গড়ে তুলে এবং রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরিক্ষায় সেই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। আগে যখন এক্সরে প্রতিফলনের মাধ্যমে অণুর গঠন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব ছিলনা, এর সরাসরি ছবি পাওয়ার প্রশ্নতো উঠেইনি, তখনো কিন্তু এই তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াতেই এগিয়ে গেছে রাসায়নিক জ্ঞান ও তার ভিত্তিতে নানা উদ্ঘাটন, এবং নানা নূতন সৃষ্টি।

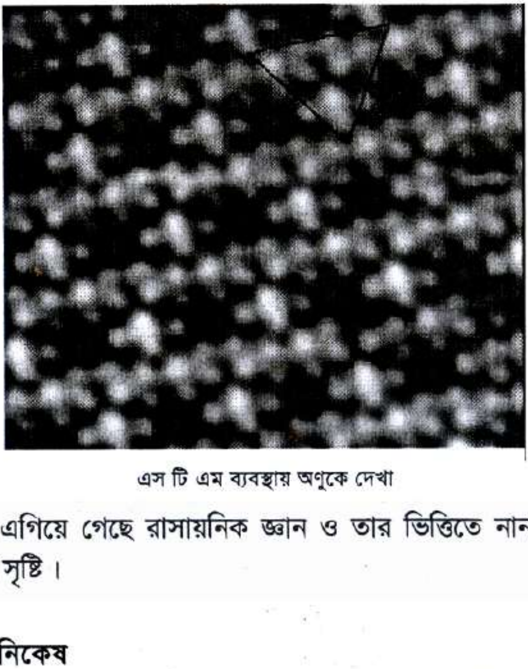

এস টি এম ব্যবস্থায় অণুকে দেখা

ফর্মুলা, বিক্রিয়া, হিসেব নিকেষ

বিভিন্ন পদার্থের একটির সঙ্গে একটি রাসায়নিক ভাবে মিশে ভিন্ন পদার্থ তৈরি হওয়া লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা এর মধ্যে কিছু নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। যেমন তাঁরা দেখলেন এক একটি যৌগের ক্ষেত্রে এই মেশার মধ্যে প্রত্যেকটি উপাদানের ভরের অনুপাতটি একই থাকে। যেমন পানি তৈরিতে হাইড্রোজেনের ও অক্সিজেনের ভরের অনুপাত সব সময় একই থাকে। একে বলা হলো নির্দিষ্ট অনুপাতের নিয়ম।

আবার দেখা গেল একই দুটি জিনিস বিভিন্ন পদার্থ তৈরির সময় ভরের বিভিন্ন রকম অনুপাতে মিশতে পারে – এক একটিতে এক একটি নির্দিষ্ট অনুপাত। যেমন পানিতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ২:১৬ অর্থাৎ ১:৮ ভরের এই অনুপাতে মিশলেও হাইড্রোজেন পার অক্সাইড তৈরিতে এরা মিশে ১:১৬ এই অনুপাতে। একে বলা হয় বিভিন্ন অনুপাতের নিয়ম।

আধুনিক রসায়নবিদদের মধ্যে পরমাণু আর অণুর ধারণাটি নিয়ে এসেছিলেন জন ডালটন। প্রধানত তাঁর প্রচেষ্টায় উল্লিখিত নির্দিষ্ট অনুপাতে মেশার ব্যাপারটিকে পরমাণুর ভাষায় রূপ দেয়া গেল। ইতোমধ্যে জানা সব মৌলিক পদার্থের একই আয়তনের তুলনামূলক ওজন নির্ণয় করে এদের পরমাণুরও তুলনামূলক ওজন নির্ণয় করে ফেলা হয়েছিল। একই মৌলিক পদার্থের পরমাণু যে বিভিন্ন ওজনের কয়েকটি বিভিন্ন রূপে বা আইসোটোপে থাকতে পারে সেটি আমরা আগের বইয়ে দেখেছি। তাই পরমাণুর এই তুলনামূলক ওজনটি হলো এক রকম গড়পড়তা ওজন, এবং সব চেয়ে হালকা পরমাণু হাইড্রোজেনের ওজনকে ১ ধরে এটি ঠিক করা হয়েছিল। পরে অবশ্য কার্বনের পরমাণুর ভিত্তিতে এটি হিসেব করাতে তাতে সামান্য ভগ্নাংশ পরিবর্তিত হয়েছে (হাইড্রোজেনের ওজন কার্বনের $\frac{১}{১২}$)। পরমাণুর ওজনের এই ব্যাপারটি মনে রাখলে আমরা এখন মেশার ক্ষৈত্রে ওজনের অনুপাত থেকে বলতে পারি অণুর মধ্যে বিভিন্ন পরমাণু কতটি করে থাকবে। যেমন কার্বন আর অক্সিজেন মিশে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড হয় তখন সব সময় আমরা দেখি ১২ গ্রাম কার্বন নিলে ৩২ গ্রাম অক্সিজেন নিতে হয়, মোট ৪৪ গ্রাম (১২+৩২) কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়ার জন্য। যেহেতু ইতোমধ্যে আমরা জানি কার্বন পরমাণুর ওজন ১২ এবং অক্সিজেন পরমাণুর ১৬, তাই এর থেকে বলতে পারি কার্বন ডাই অক্সাইডের একটি অণুতে একটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে ২টি অক্সিজেনের পরমাণু রয়েছে।

এটি জানার পর আমরা অণুটিকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করতে পারি। যেমন বিশেষ কোন রঙের ছোট বৃত্তকে কার্বন পরমাণু এবং অন্য রঙের বৃত্তকে অক্সিজেন বৃত্ত কল্পনা করে প্রথমটির একটির দুপাশে দ্বিতীয়টির দুটি এঁকে দিতে পারি। ডালটন এভাবেই অণুকে প্রকাশ করতেন। জটিলতর অণুর পক্ষে নানা রঙ নিয়ে আঁকা কঠিন হয়ে পড়ে বলে আমরা আরো এক ভাবে এটি করতে পারি। কার্বন পরমাণুর প্রতিনিধিত্ব করি শুধু বড় হাতের C অক্ষরটি লিখে, আর অক্সিজেন পরমাণুর বড় হাতের O লিখে। একটি C এর সঙ্গে দুটি O লিখে কার্বন ডাই অক্সাইড অণু বুঝানো যায়। আরো সহজ হয় যদি দুটি O না লিখে

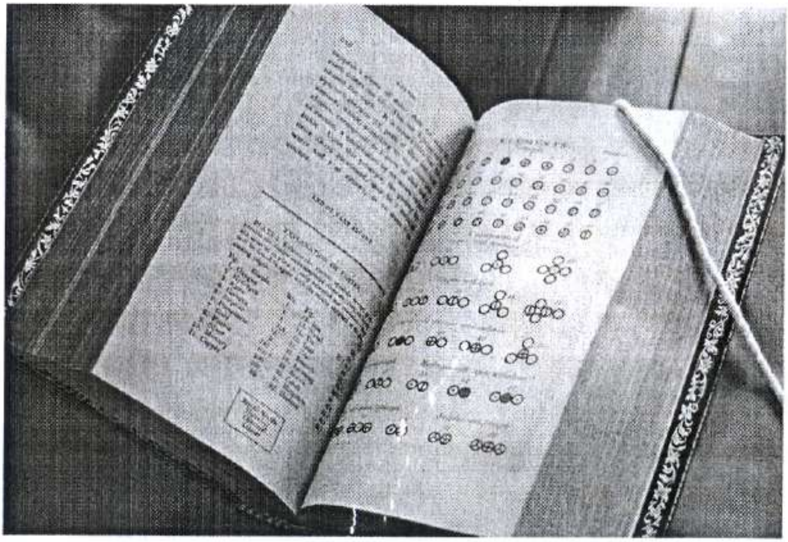

ডালটনের রচিত বইয়ে অণুকে যেভাবে দেখানো হয়েছে

একটি O এর ডানে তলার দিকে ছোট করে 2 লিখে দিই দুটি বুঝাতে– অর্থাৎ CO_2 এটিই কার্বন ডাই অক্সাইডের ফর্মুলা। পড়ার সময়ও ওভাবেই পড়ছি কার্বন ও ডাই অক্সাইড অর্থাৎ দুটি অক্সিজেন। সব মৌলের পরমাণুকে তার আদ্যাক্ষর দিয়ে বুঝাতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু একই আদ্যাক্ষরে একাধিক মৌল রয়েছে; যেমন আর্সেনিক, এলুমিনিয়াম, আরগন এই সবের জন্যই আদ্যাক্ষর হলো A। তাই দ্বিতীয় আরেকটি অক্ষর ছোট হাতে লিখে তাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে হয়। অনেক সময় তাতেও কুলায়না, যেমন আর্সেনিক ও আরগন উভয়টির দ্বিতীয় অক্ষর r, তাই একটির জন্য দ্বিতীয়, অন্যটির জন্য তৃতীয় অক্ষরে যেতে হয়েছে। তাই আরগন হলো Ar, আর্সেনিক As, এবং এলুমিনিয়াম Al। তাছাড়া আর একটু জটিলতা হলো প্রয়োজনে অথবা ঐতিহাসিক কারণে কোন কোন মৌলের চিহ্ন বেছে নেয়া হয়েছে তার প্রচলিত নাম থেকে নয় বরং তার প্রাচীন ল্যাটিন নাম থেকে। যেমন লোহার জন্য আয়রন নাম থেকে নয় বরং ল্যাটিন নাম ফেরাম থেকে Fe এই চিহ্ন বেছে নেয়া হয়েছে। এমনি ভাবে সোনা Au, রূপা Ag, পারদ Hg ইত্যাদি যা তাদের প্রচলিত নাম থেকে নয়। যাই হোক ব্যবহার করতে করতে সবাই এতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়।

ছবির মত করে অণুর কাঠামোটি তুলে ধরার সময় অথবা এর ফর্মুলা লেখার সময় বুঝার সুবিধার জন্য আমরা এর বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে খানিকটা জায়গা রেখে দিই, এমনকি কাঠামো চিত্র আঁকার সময় পরমাণুগুলোর মধ্যে লাইন টেনে এদের একটির সঙ্গে অন্যটির বন্ধনটিও দেখাই। কিন্তু আসলে অণুতে পরমাণুগুলোর মধ্যে কোন ফাঁক থাকেনা, বরং বলতে গেলে এক পরমাণু আরেক পরমাণুর মধ্যেই প্রায় ঢুকে পড়ে; কী ভাবে এটি সম্ভব তা আমরা পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর বন্ধনের আলোচনায় দেখবো।

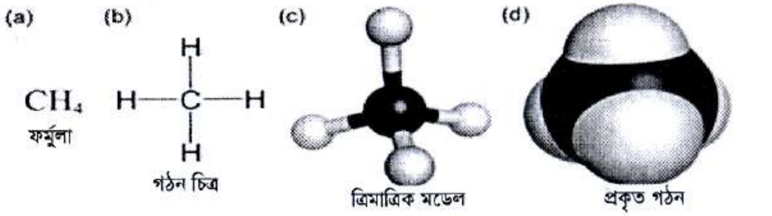

মিথেন অণুর বিভিন্ন রকম প্রতিনিধিত্ব

কার্বন আর অক্সিজেনের সম্মিলনে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরির যে উদাহরণটি উপরে দেয়া হয়েছে তা এখন আমরা ফর্মুলার সাহায্যে নিচের মত লিখতে পারি:

$$C+O_2 \longrightarrow CO_2$$

লক্ষ্য করুন অক্সিজেনকে কিন্তু ২টি অক্সিজেন পরমাণু হিসেবে লেখা হয়নি বরং ১টি অক্সিজেনের অণু হিসেবে দেখানো হয়েছে, কারণ অক্সিজেন গ্যাসে অক্সিজেন পরমাণু একা থাকেনা, দুটি পরমাণু একত্র হয়ে অক্সিজেন গ্যাসের অণু হিসেবে থাকে। হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি গ্যাসের ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটে। উপরে আমরা কঠিন কার্বনের সঙ্গে গ্যাসীয় অক্সিজেনের একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবার লিখিত প্রকাশ দেখলাম যাকে বলা হয় রাসায়নিক সমীকরণ।

হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে পানি তৈরির বিক্রিয়াটির সমীকরণ হবে:

$$2H_2+O_2 \longrightarrow 2H_2O$$

এখানে লক্ষণীয় যে কোন ফরমুলার বাঁপাশে যখন 2 লেখা হয়েছে তার মানে পুরো অণুই দুটি আছে, যেমন $2H_2$ মানে হলো দুটি হাইড্রোজেন অণু, অর্থাৎ ৪টি হাইড্রোজেন পরমাণু।

সমীকরণের উভয় দিককে মিলাতে গিয়ে আমাদেরকে ন্যূনতম দুটি পানির অণু তৈরির বিক্রিয়া দেখাতে হয়েছে এবং এ জন্য দুটি হাইড্রোজেন গ্যাস অণু নিতে হয়েছে। কারণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উভয় গ্যাসের অণুতে দুটি করে পরমাণু রয়েছে একটি নয়।

গ্যাসের ক্ষেত্রে তার আয়তন ব্যবহার করে ফর্মুলা ও বিক্রিয়ার হিসেব নিকেষ করতে কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। এটি সম্ভব হয়েছে এভোগেড্রোর আবিষ্কৃত নিয়মটির সুযোগ নিয়ে। একটি গ্যাসের আয়তন নির্ভর করে তার উত্তাপ আর চাপের উপর– এটি আমরা সিরিজের প্রথম বইটিতে দেখেছি। কিন্তু অণুর আয়তনের কোন প্রভাব কি এর উপর আছে? স্বাভাবিক ভাবেই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের অণু অক্সিজেনের অণুর চেয়ে বড়। কোন অণুর তুলনামূলক ওজন যত তত গ্রাম ঐ বস্তুটি নিলে তা বস্তুটিকে মাপার এক ধরনের একক হিসেবে কাজ করে, যাকে বলা হয় এক মোল। যেমন হাইড্রোজেন গ্যাসের অণুর ওজন যেহেতু ২, তাই তার এক মোল হবে ২ গ্রাম, সেভাবে অক্সিজেন গ্যাসের এক মোল হবে ৩২ গ্রাম, আর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের এক মোল হবে ৪৪ গ্রাম। কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরির উপরের সমীকরণটিকে আমরা অন্য ভাবেও বলতে পারি এক মোল কার্বন (১২ গ্রাম) এবং এক মোল অক্সিজেন গ্যাস (৩২ গ্রাম) করে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস (৪৪ গ্রাম) তৈরি হয়।

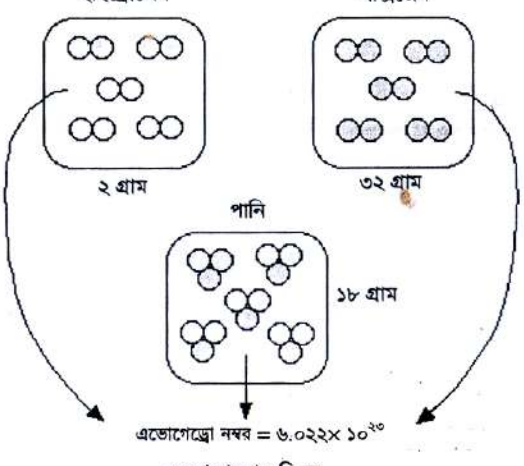

এভোগেড্রোর নিয়ম

অণুর আয়তনের কারণে আমরা আশা করতে পারি একই উত্তাপ ও চাপে রাখা এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এক মোল অক্সিজেন গ্যাসের চেয়ে বেশি জায়গা দখল করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়না, বরং একই উত্তাপ ও চাপে থাকা যে কোন গ্যাসের এক মোল সব সময় একই আয়তনের হয়। ঘরের ভেতর সাধারণত থাকে এমন একটি প্রমিত উত্তাপ ও চাপ মনে করা হয় ২০° সে ও এক এটমোসফেয়ার চাপকে– যাকে বলা হয় কক্ষ উত্তাপ ও চাপ (আর টি পি)।

কক্ষ উত্তাপ ও চাপে যে কোন গ্যাসের এক মোলের আয়তন হবে ২৪ লিটার। এই আয়তনের ভেতর গ্যাসটির কতগুলো অণু থাকবে তাও একেবারে নির্দিষ্ট– যা হলো ৬×১০^{২৩} টি– একে বলা হয় এভোগেড্রো সংখ্যা। এটিই এভোগেড্রোর নিয়ম। ঐ অবস্থায় যে কোন গ্যাসের যত মোল নেয়া হবে, তার আয়তন ২৪ লিটারের তত গুণ। এখন কক্ষ উত্তাপ ও চাপে ২৪ লিটার গ্যাস নিয়েই আমরা তার ওজন থেকে বলতে পারবো তার অণুর ওজন। অণুর গঠন জানতে ব্যাপারটি বেশ সুবিধাজনক হয়ে পড়ে। যেমন ২ লিটার হাইড্রোজেন ও ১ লিটার অক্সিজেন যদি বিক্রিয়া করে ২ লিটার জলীয় বাষ্প তৈরি করে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি জলীয় বাষ্পের অণুতে ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও ১টি অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে।

আমরা খুব সহজ উদাহরণ ব্যবহার করলেও এর চেয়ে অনেক জটিলতর বিক্রিয়ায় অণুর চেহারা কী দাঁড়ালো একই রকমের হিসেব নিকেষ থেকে তাত্ত্বিক ভাবে আমরা দাঁড় করাতে পারি।

পরমাণুতে পরমাণুতে বন্ধন

বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে বন্ধনের কারণেই অণু গঠিত হচ্ছে। এই বন্ধনটি ঘটে প্রত্যেক পরমাণুর বাইরের দিকটা একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া করার ফলে। সিরিজের আগের বইটিতে আমরা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া দেখেছি – তাতে অংশ নিয়ে থাকে পরমাণুর কেন্দ্র স্থল নিউক্লিয়াস।

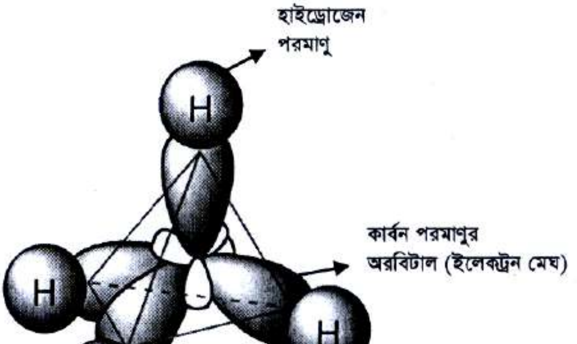

মিথেনে (CH_4) কার্বনের চারটি বন্ধন (দিক নির্ভর অরবিটাল) পরস্পর সুনির্দিষ্ট কোণ করে বিশেষ আকৃতির ত্রিমাত্রিক গঠনে। প্রত্যেকটিতে কার্বন পরমাণুটি একটি করে হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একটি করে ইলেকট্রন শেয়ার করে।

কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ার কাজ তার বাইরের ইলেকট্রন সমূহের, আরো বিশেষ করে একেবারে বাইরের দিকের ইলেকট্রনগুলোর। আগের বইতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণু চিত্র পেতে গিয়ে আমরা দেখেছি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন অরবিটালে বিন্যস্ত এক রকম ইলেকট্রন মেঘ। এই মেঘ আসলে একটি গাণিতিক সম্ভাবনার মেঘ যা ইলেকট্রনের অবস্থান সম্ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করছে। একটি ইলেকট্রন থাকলে তারও এরকম মেঘ হতে পারে। বন্ধনে আসার সময় দুই পরমাণুর ইলেকট্রন মেঘ একে অন্যের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে, মেঘের কিছু অংশ উভয়েই শেয়ার করতে পারে, অথবা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করতে পারে। এজন্যই অণুতে পরমাণুগুলো এতটা সন্নিকটবর্তী হয়। বন্ধনের প্রকৃতি শুধু এদের মধ্যে বন্ধনের জোরটিই ঠিক করে দেয়না, বরং পরমাণুগুলো অণুতে সংযুক্ত হয়ে অণুর কী আকৃতি গড়ে তুলবে তাও ঠিক করে দেয়। এগুলোর সবই কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী সূক্ষ্ম ভাবে হিসেব করা যায়– যদিও হিসেবটি প্রায়শ অত্যন্ত জটিল এবং উচ্চ ক্ষমতার কম্পিউটারের প্রয়োজন হতে পারে।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণু চিত্রে আমরা দেখেছি বিভিন্ন অরবিটালে সর্বোচ্চ কতগুলো ইলেক্ট্রন থাকতে পারবে তা সুনির্দিষ্ট। সেই অনুযায়ী ইলেকট্রন যদি না থাকে তা হলে অরবিটালটি অসম্পূর্ণ থাকে। সোডিয়াম ধাতুর পরমাণুতে সব থেকে বাইরের অরবিটালটিতে একটি মাত্র ইলেকট্রন থাকে; তাই সেটি খুবই অসম্পূর্ণ। এজন্য সুযোগ পেলে সোডিয়াম পরমাণু এই ইলেকট্রনটিকে অন্য কোন পরমাণুকে দিয়ে নিজে আরো বেশি স্থিত অবস্থায় যেতে চায়। এভাবে একটি ইলেকট্রন হারালে সোডিয়াম পরমাণু ধনাত্মক সোডিয়াম আয়নে পরিণত হয় কারণ এতে তখন ১১টি প্রোটন ও ১১টি ইলেকট্রনের বদলে (বৈদ্যুতিক ভাবে নিরপেক্ষ) ১১টি প্রোটন ও ১০টি ইলেকট্রন থাকে। অন্যদিকে আমরা অধাতব ক্লোরিন অণুর দিকে তাকাতে পারে। এখানে সবার বাইরের অরবিটালটিতে একটি ইলেকট্রন কম রয়েছে। কাজেই এটি সুযোগ পেলে অন্য কোন পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এই অভাবটি মেটাতে চায়। এভাবে একটি বাড়তি ইলেকট্রন গ্রহণ করলে ক্লোরিন পরমাণু ঋণাত্মক ক্লোরিন আয়নে পরিণত হয়। সোডিয়াম আর ক্লোরিন পরমাণু পরস্পর কাছে আসলে সোডিয়াম তার একক ইলেকট্রনটি ক্লোরিনকে দিয়ে দেবে কারণ ক্লোরিনের পক্ষ থেকে তার চাহিদা রয়েছে। ফলে এখন একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক আয়ন পরস্পরের কাছে রয়েছে– যারা স্বাভাবিক ভাবেই বৈদ্যুতিক আকর্ষণে পরস্পরের আবদ্ধ হবে। এভাবে উভয়ের বন্ধনের মাধ্যমে সোডিয়াম ক্লোরাইড গঠিত হয়– যেমনটি অনেক ধাতব ও অধাতব পদার্থের মধ্যে ঘটে থাকে। এমন

বন্ধনকে আয়নিক বন্ধন বলা হয়। সব ক্ষেত্রে অবশ্য একটি পরমাণুর সঙ্গে একটি পরমাণুই বন্ধনে যাবে এমন কথা নেই। যেমন ম্যাগনেশিয়াম পরমাণুর বাইরের অরবিটালে দুটি ইলেকট্রন থাকে বলে (এখনো অসম্পূর্ণ) এগুলো গ্রহণ করতে দুটি ক্লোরিন পরমাণুর প্রয়োজন হয়। ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের ফরমুলা তাই $MgCl_2$, যেখানে সোডিয়াম ক্লোরাইডের NaCl (Na হলো সোডিয়ামের চিহ্ন)। পরমাণুর ইলেকট্রনের বিন্যাস অনুযায়ী কোন কোন মৌল শুধু একটি অনুরূপ পরমাণুকে বন্ধনে নিতে পারে এক্ষেত্রে সোডিয়াম ও ক্লোরিন উভয়েই সে রকম। এজন্য বলা হয় এদের বন্ধন সংখ্যা বা ভ্যালেন্সি হলো এক। আবার কোন পরমাণু এরকম এক ভ্যালেন্সির দুটি পরমাণুকে বন্ধনে নিতে পারে– তাই এদের ভ্যালেন্সি ২। ম্যাগনেশিয়ামের ভ্যালেন্সি যে দুই সেটি উপরের উদাহরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে। আয়নিক বন্ধন ছাড়া অন্যান্য বন্ধনের ক্ষেত্রেও এরকম নানা ভ্যালেন্সি হতে পারে।

আরেকটি খুব সচরাচর বন্ধন শক্তি হচ্ছে দুটি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন আদান-প্রদান না করে বরং দুটি পরমাণুর একই ইলেকট্রনকে শেয়ার করার মাধ্যমে। বাইরের দিকের এক বা একাধিক ইলেকট্রন তখন এমন আচরণ করে যেন এটি একই সঙ্গে দুটি পরমাণুরই আওতায় রয়েছে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী এটি খুবই সম্ভব। সে ক্ষেত্রে নিজের সব চেয়ে বহিস্থ অরবিটালে একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি থাকলে অন্য পরমাণুর সঙ্গে একটি ইলেকট্রন শেয়ার করে এই ঘাটতি মিটাতে পারে। অন্যদিকে যার সাথে শেয়ার করছে সেটিরও একটি ইলেকট্রন ঘাটতি রয়েছে যাও একই সঙ্গে মিটতে পারে। এভাবে উভয়কে উভয়ের ইলেকট্রন শেয়ার করতে হয় বলে পরমাণু দুটি বন্ধনে থাকে। সাধারণত অধাতব মৌল অন্য অধাতব মৌলের সঙ্গে এরকম বন্ধনই তৈরি করে। হাইড্রোজেনের একটি মাত্র ইলেকট্রনটি যে অরবিটালে আছে তাতে ২টি ইলেকট্রন থাকার কথা, তাই তার একটি ঘাটতি। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু যদি প্রত্যেকের ইলেকট্রনটি পরস্পর

দুটি অক্সিজেন পরমাণুর কোভ্যালেন্ট বন্ধনে অক্সিজেন গ্যাসের অণু। প্রতিটি থেকে দুটি করে ইলেকট্রন উভয়ে শেয়ার করছে।

শেয়ার করে তা হলে দুটিই পূর্ণতা পায় এবং শেয়ার করতে গিয়ে উভয়ে বন্ধনে থাকে। এরকম বন্ধনকে বলা হয় কো-ভ্যালেন্ট বন্ধন। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু এরকম বন্ধনের দ্বারা হাইড্রোজেন গ্যাসের অণু গঠন করে। স্পষ্টত হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি এক। অক্সিজেনের সর্ববহিস্থ অরবিটালে ইলেকট্রনের ঘাটতি দুটি। এ ঘাটতি ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে মেটাতে পারে এক ভ্যালেন্সির দুটি পরমাণু। দুটি হাইড্রোজেন তা করলে পানির অণু গঠিত হয়– কো-ভ্যালেন্ট বন্ধনের মাধ্যমে। স্পষ্টত অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি দুই। কার্বনের ভ্যালেন্সি চার। তাই কার্বন ডাই অক্সাইড গঠনের সময় দুটি অক্সিজেন পরমাণু কার্বনের একটি পরমাণুর সঙ্গে কো-ভ্যালেন্ট বন্ধন তৈরি করে। প্রতিটি অক্সিজেন থেকে ২টি করে ৪টি ইলেকট্রন কার্বনের বাইরের অরবিটালের ৪টি ইলেকট্রনের সঙ্গে শেয়ারের মাধ্যমে একত্র হয়ে ঐ অরবিটালে অপরিহার্য ৮টি ইলেকট্রনের এক রকম যোগান দেয়, এবং তাকে সম্পূর্ণ করে। এমনি ভাবে দেখা যায় নাইট্রোজেনের ভ্যালেন্সি তিন। তাই নাইট্রোজেন তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে ইলেকট্রন শেয়ার করে এমোনিয়া অণু গঠন করে যার ফর্মুলা NH_3।

ধাতব পদার্থের সঙ্গে ধাতব পদার্থের বন্ধন সৃষ্টির জন্য অন্য এক ধরনের বন্ধন রয়েছে, সেটি আমরা পড়ে দেখবো। তা ছাড়াও আরো কয়েক রকমের বন্ধন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করে।

পর্যায় সারণি

উনবিংশ শতাব্দীতেই রাশিয়ান রসায়নবিদ মেন্ডলীভ একটি চমৎকার জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন যা বিভিন্ন মৌলগুলোর মধ্যে একটি সুন্দর শৃঙ্খলা উদ্ঘাটন করেছে। সব চেয়ে হালকা মৌল হাইড্রোজেন থেকে তখনকার সময়ে জানা সব চেয়ে ভারি মৌল পর্যন্ত সব মৌলকে তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়ে যাবার সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে নির্দিষ্ট সংখ্যক মৌলের একটি সারির পর পরবর্তী মৌলকে আবার প্রথমটির নিচে এনে দ্বিতীয় সারি শুরু করলে, এবং এমন ভাবে পর্যায়ক্রমে একই সংখ্যা পর পর নূতন সারিবদ্ধ করে মৌলগুলোকে সাজালে যে পর্যায় সারণি বা পিরিয়ডিক টেবিল পাওয়া যায় তাতে উপর থেকে নিচের দিকে প্রত্যেকটি গ্রুপের মৌলগুলোর রাসায়নিক গুণাগুণে ও আচরণে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। সেই সময় থেকে রসায়নবিদদের কাছে মৌলের ও তাদের বিক্রিয়ার হদিশ পাওয়ার জন্য এই পর্যায় সারণিটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করছে। কিন্তু কেন যে এরকম পর্যায়-ক্রমিক ভাবে মৌলগুলো একই গুণের অধিকারী হয়েছে তার কারণ নির্ণয় তখন সম্ভব হয়নি। পরমাণুর কোয়ান্টাম

তাত্ত্বিক চিত্র পাওয়ার পরই শুধু এর কারণ বুঝা গেছে। সেটি আমরা একটু পরে দেখবো। আগে দেখি সারণিটি কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

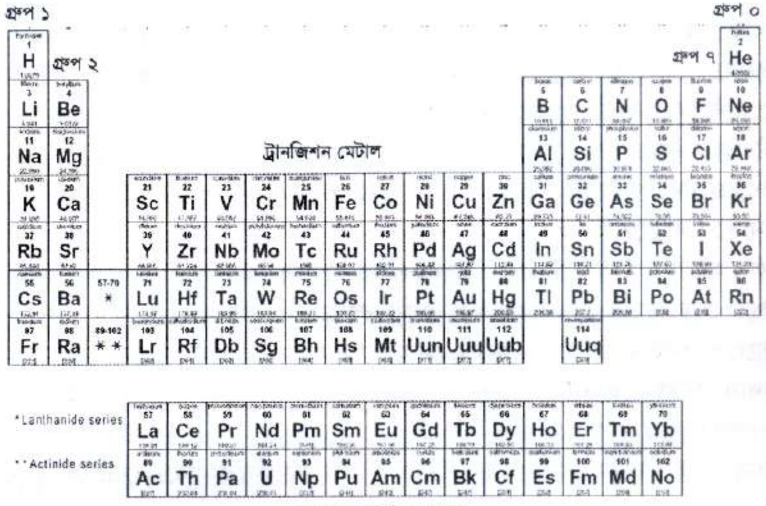

আধুনিক পর্যায় সারণি

মেন্ডলীভের আমলের পর সারণিটিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে, এবং এটি আরো সম্পূর্ণতা পেয়েছে। কিন্তু তখনই এটি এতো আস্থাযোগ্য ছিল যে সারণির কয়েকটি জায়গায় জানা কোন মৌল তখন না থাকলেও মেন্ডলীভ সাহসিকতার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেই গ্রুপের সেই স্থানের প্রত্যাশিত গুণাগুণ সম্পন্ন মৌল অবশ্যই পাওয়া যাবে। পরে ঠিক ঠিক তা পাওয়া গিয়েছে। সারণিটি শেষ পর্যন্ত যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাতে এতে ০ থেকে ৭ এই আটটি গ্রুপে মৌলগুলো প্রধানত রয়েছে। ০ গ্রুপের সবই গ্যাস যারা কারো সঙ্গেই বিক্রিয়া করতে চায়না, তাই এদেরকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয়– হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন ইত্যাদি। ১ নম্বর গ্রুপের মৌলগুলো হল এলকেলী ধাতু, এগুলো নরম সহজে গলে যায় এমন ধাতু, পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে এলকেলী বা ক্ষার জাতীয় দ্রবণ তৈরি করে – লিথিয়াম, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম বিশেষ করে এই গুণের। গ্রুপ ২ এর মৌলগুলোও ধাতু কিন্তু তুলনামূলক ভাবে এলকেলী ধাতুর চেয়ে শক্ত ও উচ্চতর গলনাঙ্কের– বেরিলিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম ইত্যাদি। তবে এগুলোর বিক্রিয়া করার প্রবণতা গ্রুপ ১ এর ধাতুগুলোর চেয়ে কম। দুটি বিষয়ে ১ আর ২ গ্রুপের মধ্য মিল দেখা যায়– যতই নিচের দিকের মৌলে আসি ততই বিক্রিয়ার তীব্রতা বাড়ে, গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক হ্রাস পায়। গ্রুপ ৭ এর মৌলগুলো হচ্ছে হেলোজেন নামের মৌল– ক্লোরিন, ফ্লোবিন, ব্রোমিন, আয়োডিন – সবই

অধাতব ও খুব বিক্রিয়াশীল; প্রথম তিনটি বেশ বিষময়ও বটে। ৩ থেকে ৬ পর্যন্ত গ্রুপগুলো বুঝতে প্রত্যেক সারির বাম থেকে ক্রমান্বয়ে ডানের দিকে মৌলগুলোর গুণাগুণ লক্ষ্য করাই ভাল হবে। যত ডানে যাব ধাতব থেকে গুণ অধাতবের দিকেই বেশি যায়। সর্ববামে সব চেয়ে বেশি ধাতব, সর্বডানে সবচেয়ে বেশি অধাতব। মাঝে ৪ গ্রুপের মৌলগুলো যেমন কার্বন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম ইত্যাদির গুণ ধাতব ও অধাতবের মাঝামাঝি বলা যায়। প্রায় সব মৌলই অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অক্সাইড তৈরি করে। অক্সাইডে অক্সিজেনের পরমাণুর সংখ্যা ও ধাতুর পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত ক্রমে ডানদিকে বাড়তে থাকে।

পর্যায় সারণির মাঝখানে থাকা অনেকগুলো ধাতুকে এক সঙ্গে ট্রানজিশন মেটাল আখ্যা দেয়া হয়। এদের গুণাগুণ একটু ব্যতিক্রমী ধরনের- যেমন খুব সুনির্দিষ্ট ভ্যালেন্সি নেই। উদাহরণ স্বরূপ লোহা কোন কোন যৌগ গঠনে ২ ভ্যালেন্সি দেখায় আবার অন্য কোনটায় ৩ ভ্যালেন্সি দেখায়। ট্রানজিশন মেটালগুলো সাধারণত খুব শক্ত ও উচ্চ গলনাঙ্কের ধাতু, খুব সহজে বিক্রিয়া করেনা। পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিত্তিতে পর্যায় সারণিকে নিচে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রেও এরা কিছু ব্যতিক্রমী।

কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক ভাবে পরমাণু চিত্র পাওয়ার পর এখন আমরা বুঝতে পারছি যে পর্যায় সারণির এক একটি গ্রুপের মৌলগুলোর একই রকম গুণ কারণ তাদের সর্ববহিস্থ অরবিটালে ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান। ০ গ্রুপের সব মৌল নিষ্ক্রিয় গ্যাস কারণ এদের বহিস্থ অরবিটালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইলেকট্রন থাকাতে এরা স্বয়ংসম্পূর্ণ– কারো সঙ্গে ইলেকট্রন আদান-প্রদান করতে হয়না, শেয়ারও করতে হয়না। গ্রুপ ১ এর মৌলগুলোতে বহিস্থ অরবিটালে একটি ইলেকট্রন থাকায় এদের সবকটির অনেকগুলো গুণ একই, এদের ভ্যালেন্সি ১। গ্রুপ ২ এর ক্ষেত্রে এরকম ইলেকট্রন সংখ্যা ২, এদের ভ্যালেন্সি ২। দুই গ্রুপের ক্ষেত্রেই ধাতুগুলো ইলেকট্রন দানের জন্য তৈরি থাকে। অন্যদিকে গ্রুপ ৭ এর মৌলগুলো পরস্পর একই গুণের কারণ তাদের সবকটির বহিস্থ অরবিটালে একটি ইলেকট্রন ঘাটতি আছে। এই জন্য এগুলো গ্রুপ ১ বা গ্রুপ ২ এর মৌলগুলো থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেগুলোর সঙ্গে সহজে বিক্রিয়া করে আয়নিক বন্ধনের প্রক্রিয়ায়। গ্রুপ ২ এর মৌলগুলো গ্রুপ ১ এর তুলনায় এই বিক্রিয়া কম তীব্র ভাবে করে কারণ ২টি ইলেকট্রন দান করার প্রক্রিয়া একটি দান করার চেয়ে দুরূহতর।

গ্রুপ ১ বা গ্রুপ ২ এর উপর থেকে নিচের দিকে গেলে বিক্রিয়ার তীব্রতা ক্রমাগত বাড়ে তার কারণ নিচের দিকে পরমাণু ক্রমাগত বড়, তাই সর্ববহিস্থ

অরবিটাল নিউক্লিয়াস থেকে অধিকতর দূরে, এজন্যে তার পক্ষে ইলেকট্রন দান সহজতর। সারিগুলো ধরে যত ডানে যাই তত ধাতব থেকে অধাতব গুণের দিকেই বেশি যাই, কারণ ধাতুর পরমাণুর প্রবণতা হলো ইলেকট্রন দান করা। সর্ববহিস্থ অরবিটালে ইলেকট্রনের সংখ্যা ডান দিকে ক্রমে বাড়তে থাকে বলে দান করা ক্রমে কঠিন হয়ে শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করা অর্থাৎ অধাতব গুণটিই প্রাধান্য লাভ করে। এ ভাবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই পর্যায় সারণি অনুযায়ী মৌলগুলোর আচরণ আসলে এগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাসের উপরেই নির্ভর করছে।

নানা রসায়ন

কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আমরা বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করে জটিল একটি যৌগিক পদার্থকে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত সরল যৌগে পরিণত করি– রাসায়নিক ভাবে ভেঙ্গে ফেলি। অনেক ক্ষেত্রেই এ কাজে আমরা তাপ ব্যবহার করি। যেমন তাপের ফলে ক্যালশিয়াম কার্বনেট ক্যালশিয়াম অক্সাইড (চূণ) এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসে ভেঙ্গে যায়। এতে যা উৎপন্ন হলো তার সব পরমাণু কিন্তু শুরুর ঐ ক্যালশিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) থেকে এসেছে– ক্যালশিয়াম, কার্বন, অক্সিজেন। সমীকরণটি হলো:

$$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$$

শুধু তাপ নয় আলো ব্যবহার করেও কোন কোন রাসায়নিক পদার্থকে ভেঙ্গে ফেলা যায়। ডিজিটাল ক্যামেরা আসার আগে ফিল্ম ব্যবহার করে আমরা যে ফটো তুলতাম সেই ফিল্মে সিলভার ক্লোরাইডের উপর আলো পড়ে তা ভেঙ্গে সিলভার আর ক্লোরিনে পরিণত হয় বলেই ছবি উঠতে পারে। ব্যাপারটি এরকম:

$$2Ag\,Cl \xrightarrow{\text{আলো}} 2\,Ag + Cl_2$$

সিলভার ক্লোরাইড   সিলভার   ক্লোরিন গ্যাস

কোন কিছু যখন আমরা পোড়াই– সেটি একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া যাকে দহন বলা হয়। এতে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে অক্সাইড তৈরি হয় এবং শক্তি উৎপাদিত হয়।

রান্নার চুলায় প্রাকৃতিক গ্যাস মিথেন যখন পোড়াই তখন বিক্রিয়াটি হলো:

$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O + \text{শক্তি}$$

মিথেন গ্যাস   অক্সিজেন গ্যাস   কার্বন ডাই অক্সাইড   জলীয় বাষ্প

কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি দুটিই অক্সাইড। এতে তাপ সৃষ্টি হয়, আলো বা শব্দ তেমন সৃষ্টি হয়না। আবার তারাবাজি রূপে যখন ম্যাগনেশিয়াম ধাতুকে পুড়ি তখন উজ্জ্বল আলো, কিছু তাপ এবং কিছু শব্দও সৃষ্টি হয় যার সবই শক্তি।

$2M_g + O_2 \longrightarrow 2M_gO$ + শক্তি

ম্যাগনেশিয়াম অক্সিজেন ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড

এই দহনের বিক্রিয়ায় আমরা শক্তি তৈরি হতে দেখছি। তার মানে বিক্রিয়াটিই এমন যে এটি ঘটতে গিয়ে শক্তি নির্গত হয়। এমন বিক্রিয়া দহন ছাড়াও আরো নানা রকমের আছে। যেমন সিলভার নাইট্রেটের সঙ্গে লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) মিশালে মিশ্রণটি গরম হয়ে পড়ে। এ রকম সব বিক্রিয়াকে তাই এক্সোথার্মিক বা তাপ-উৎপাদী বলা হয়। যে সব বিক্রিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটে সেগুলোতে হঠাৎ করে প্রচুর শক্তি উৎপাদিত হয়। আবার কোন কোন বিক্রিয়ায় বাইরে থেকে তাপ নিয়ে ঘটতে হয়, তাই সেটি উত্তাপ কমিয়ে ফেলে। একে এন্ডোথার্মিক বা তাপশোষী বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ এক ধরনের মিষ্টান্ন বাচ্চারা পাউডারের মত খেতে পছন্দ করে যাতে সাইট্রিক এসিডের সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট নামক পাউডার মেশানো হয়। মুখে দিলে বিক্রিয়া করলে মুখে বেশ ঠান্ডা অনুভূত হয় তাপশোষী বিক্রিয়ার কারণে। এরকম তাপ-উৎপাদী অথবা তাপশোষী হবার কারণ কী? পুরো বিষয়টি আসলে পরমাণুতে পরমাণুতে বন্ধনগুলো ভাঙ্গার এবং গড়ার কারণে ঘটে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন কোন যৌগ ভেঙ্গে যায়, তাই বন্ধন ভাঙ্গার প্রশ্ন উঠে; আবার কোন কোন নূতন যৌগ সৃষ্টি হয়, তাই বন্ধন গড়ারও প্রশ্ন উঠে। বন্ধন যখন ভাঙ্গে তখন ভাঙ্গার জন্য বাইরে থেকে শক্তির দরকার হয়; আবার বন্ধন যখন গড়ে তখন কিছু শক্তি বেরিয়ে আসার সুযোগ হয়। যে বিক্রিয়ায় বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় শক্তির তুলনায় এরকম বেরিয়ে আসা শক্তি বেশি হয় তা শক্তি-উৎপাদী হয়। যেখানে এর উল্টোটি হয় তখন তা শক্তিশোষী হয়।

উপরে আমরা সাইট্রিক এসিডের কথা বলেছি, এটি দুর্বল একটি এসিড যা খাদ্যদ্রব্যেও ব্যবহৃত হয়, যেমন লেবুর রসে পাওয়া যায়। অন্য অনেক এসিড কিন্তু অনেক জোরালো এবং শরীরের জন্য খুব ক্ষতিকর হতে পারে। সব এসিডের অবশ্য কিছু সাধারণ গুণ আছে– যেমন এরা টক স্বাদের (যদিও খাদ্যদ্রব্যের এসিডগুলো ছাড়া অন্যগুলোর স্বাদ নিতে যাওয়া বিপজ্জনক), ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে (ধাতুকে আক্রমণ করে), লিটমাস কাগজকে লাল রঙ দেয় ইত্যাদি। এসব গুণের মূলে রয়েছে এসিড মাত্রেই হাইড্রোজেন আয়ন থাকে যা কিনা ইলেকট্রন ত্যাগ করা ধনাত্মক চার্জযুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু। পরিচিত জোরালো এসিডগুলোর মধ্যে রয়েছে সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), নাইট্রিক এসিড (HNO_3), ইত্যাদি।

এসিডের উল্টো গুণ রয়েছে এলকেলী বা ক্ষারের। এরা স্পর্শে সাবানের অনুভূতি দেয় (জোরালো এলকেলীর ক্ষেত্রে স্পর্শ করা বিপজ্জনক), এমোনিয়া ছাড়া সব

এলকেলী এমোনিয়াম যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, লিটমাস কাগজকে নীল রঙ দেয় ইত্যাদি। এসব গুণের কারণ হলো এলকেলী দ্রবণে সব সময় হাইড্রোক্সাইড আয়ন থাকে - যা কিনা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্বক হওয়া OH গ্রুপ।

সুপরিচিত জোরালো এলকেলীগুলোর মধ্যে রয়েছে: সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH), পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH), ক্যালশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Ca(OH)_2$)।

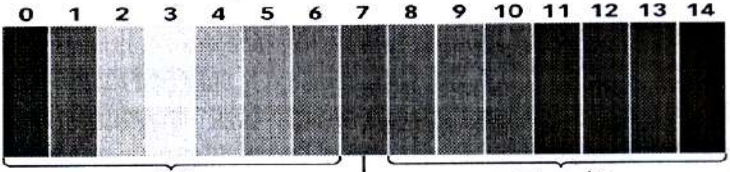

এসিডিটি পরিমাপের পিএইচ স্কেল

এসিড ও এলকেলীর গুণ পরস্পর বিরোধী– এদেরকে এসিডিটি মাপার একটি স্কেলে দাঁড় করালে কোন কিছুর এসিড গুণ যত বেশি হবে তা এই স্কেলের তত বেশি একদিকে যাবে, আর এসিডিটি যত কম হবে (এলকেলী গুণ যত বেশি হবে) তত এটি স্কেলের অন্য দিকে যাবে। স্কেলটিকে ০ থেকে ১৪ মানে সাজানো হয় প্রত্যেকটি মানকে বসা হয় পি-এইচ (pH)। পিএইচ যত কম হবে এসিডিটি তত বেশি; ০ হলে সব চেয়ে বেশি। pH যত বেশি হবে এসিডিটি তত কম এলকেলাইন গুণ তত বেশি, pH ১৪ হলে এলকেলাইন গুণ সব চেয়ে বেশি। স্কেলের ঠিক মাঝের বিন্দু হলো ৭; pH ৭ হওয়া মানে একেবারে নিরপেক্ষ– না এসিড, না এলকেলী। এসিড ও এলকেলী যদি বিক্রিয়া করে তা হলে আমরা পাই সল্ট আর পানি, যা কিনা পুরোই নিরপেক্ষ। কোন এসিডকে কতখানি এলকেলী পুরাপুরি নিরপেক্ষ করতে পারে তা থেকে আমরা বুঝতে পারি ওটি কী রকম জোরালো। বিক্রিয়াটির একটি উদাহরণ নেয়া যাকে:

$$\underset{\text{(এলকেলী)}}{Na(OH)} + \underset{\text{(এসিড)}}{HCl} \longrightarrow \underset{\text{(সল্ট)}}{NaCl} + \underset{\text{(পানি)}}{H_2O}$$

সল্ট অবশ্য অন্য ভাবেও তৈরি করা যায়, যেমন ধাতুর সঙ্গে এসিড যে রকম জোরালো বিক্রিয়া করে তাতেও সল্ট তৈরি হয়। উদাহরণ:

$$\underset{\text{জিংক}}{Zn} + \underset{\text{সালফিউরিক এসিড}}{H_2\,SO_4} \longrightarrow \underset{\text{জিংক সালফেট}}{Zn\,SO4} + \underset{\text{হাইড্রোজেন}}{H_2}$$

একটি বিক্রিয়া কত জোরালো হবে তা অনেক সময় বিক্রিয়ার বেগের উপর নির্ভর করে। এর মানে বিক্রিয়াটি কত দ্রুত বা কত ধীরে ধীরে ঘটছে। শিল্প কারখানায় বা ল্যাবোরেটরীতে আমরা সাধারণত বিক্রিয়ার এই গতিবেগ উত্তাপ বৃদ্ধি করে বাড়াতে পারি। বিক্রিয়ায় যদি কোন কঠিন পদার্থ ব্যবহৃত হয়, তা হলে দেখা যায় যে ওটি বড় টুকরায় দিলে যে বেগে বিক্রিয়া ঘটে, তাকে ভেঙ্গে ছোট ছোট টুকরো করে দিলে তার চেয়ে দ্রুততর হয়, পাউডার করে দিলে আরো দ্রুত হয়। এর কারণ হলো টুকরা বা গুড়া যত ছোট হবে কঠিন পদার্থটির পৃষ্ঠতল তত বেশি হবে, সেক্ষেত্রে বিক্রিয়ারত অন্য পদার্থগুলোর সঙ্গে এটি বেশি সংস্পর্শে আসতে পারবে, বিক্রিয়া দ্রুততর হবে। পৃষ্ঠতলের পরিমাণটি বিক্রিয়ার গতি বাড়াতে খুব সহায়ক হয়।

আরো এক ভাবে বিক্রিয়া ঘটার জন্য সুবিধাজনক বেশি পৃষ্ঠতলের সৃষ্টি করা যায়– তা হলো ক্যাটালিষ্ট বা অনুঘটক ব্যবহার করে। ক্যাটালিষ্ট হলো এমন কিছু বস্তু যা বিশেষ বিশেষ বিক্রিয়ায় ব্যবহার করলে বিক্রিয়ার বেগ বাড়িয়ে দেয় কিন্তু নিজে শেষ পর্যন্ত বিক্রিয়ায় অংশ নেয়না, আগের মতই থেকে যায়। এখন নানা রকম বিক্রিয়ার জন্য যথাযথ ক্যাটালিষ্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগই ট্রানজিশন মেটাল অথবা ট্রানজিশন মেটালের যৌগ। যেমন নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন থেকে এমোনিয়া তৈরি রাসায়নিক শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া। লোহা এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দক্ষ ক্যাটালিষ্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। শিল্পের ক্ষেত্রে অধিক উত্তাপ ব্যবহার করে বিক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধি করার চেয়ে ক্যাটালিষ্ট ব্যবহার করে তা করা অনেক ব্যয়সাশ্রয়ী। উত্তাপ বাড়াতে অনেক জ্বালানি খরচ করতে হয় বলে স্পষ্টত ক্যাটালিষ্ট ব্যবহার করাটাই কাম্য। আরো ভাল কথা হলো বিক্রিয়ায় ক্যাটালিষ্ট ব্যবহৃত হয়ে শেষ হয়ে যায়না বলে একই ক্যাটালিষ্ট বার বার ব্যবহার করা সম্ভব।

ক্যাটালিষ্ট সাধারণত যেভাবে কাজ করে তা হলো এটি বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী অণুগুলোকে পরস্পরের সংস্পর্শে আসার জন্য একটি পরোক্ষ ব্যবস্থা করে দেয়। সে ক্ষেত্রে অণুগুলো সরাসরি পরস্পরের সংস্পর্শে না গিয়ে প্রথম বরং ক্যাটালিষ্টের তলে সংলগ্ন হয়। এখানে সংলগ্ন অবস্থায় এরা পরস্পরের খুব কাছে আসতে পারে। এভাবে পৃষ্ঠতল বাড়াবার জন্য ক্যাটালিষ্টকে সাধারণত সরু তার বা গুড়ো আকারে দেয়া হয়। আসলে বিক্রিয়া সহজে ঘটাবার জন্য ক্যাটালিষ্ট একটি প্রক্রিয়াই শুরু করে দিতে পারে। সাধারণত বিক্রিয়ার শুরু হতেই যে বাধার সম্মুখীন হয় তা হলো অণুগুলোর বন্ধন ভাঙ্গার জন্য একটি প্রারম্ভিক শক্তির দরকার হয় যেটি না হলে পর্যাপ্ত শক্তিতে অণুগুলো উত্তেজিত হয়ে বন্ধন ভাঙ্গতে পারে। ক্যাটালিষ্টের উপস্থিতি এই প্রারম্ভিক প্রয়োজনীয়

শক্তিকে কমিয়ে ফেলে যাতে বিক্রিয়াটি শুরু হতে পারে। এর কিছু বিক্রিয়া শক্তি-উৎপাদী বলে সেই শক্তিতেই চলতে পারে আরো বিক্রিয়া– ফলে দ্রুত বিক্রিয়াটি অধিক গতিবেগ নেয়।

একটি কাচপাত্রে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস রেখে ব্যাপারটি নাটকীয় ভাবে পরীক্ষা করা যায়। ওভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা রেখে দিলেও এই দুই গ্যাস পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করবেনা। এখন ঢাকনি খুলে একটি প্লাটিনাম তার পাত্রে ঢুকালে সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত বিস্ফোরণের মত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে পানি তৈরি করবে। প্লাটিনাম তারটি যেমনি ছিল তেমনিই থাকবে। এতে দেখা যায় ক্যাটালিষ্ট কাজটিকে কতখানি দ্রুততর করে।

কার্বন ভিত্তিক রসায়ন

কার্বন এই মৌলিক পদার্থের একটি বড় গুণ হলো এটি অসংখ্য বিভিন্ন রকমের যৌগিক পদার্থে ব্যাপক ভাবে অংশ নিতে পারে। কার্বনের অক্সাইড– কার্বন ডাই অক্সাইড ও কার্বন মনো অক্সাইড, নানা রকম কার্বনেট যৌগ, ইত্যাদিতো প্রকৃতিতে প্রচুর রয়েছেই; কার্বনের বড় গুরুত্ব হলো জীবের সঙ্গে জড়িত প্রায় সব রকমের পদার্থে কার্বনের বড় ভূমিকা রয়েছে। জীবদেহের রসায়ন তাই মুখ্যত কার্বন যৌগেরই রসায়ন। জীবের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা কার্বন যৌগকে অর্গানিক যৌগ বলা হয়। এগুলোর মধ্যে সাধারণভাবে এত মিল রয়েছে এবং এরা এত গুরুত্বপূর্ণ যে এদের নিয়ে রসায়নের একটি সম্পূর্ণ নূতন দিক উনবিংশ শতাব্দী থেকেই সৃষ্টি হয়ে রয়েছে – যাকে বলা হয় অর্গানিক ক্যামিষ্ট্রি।

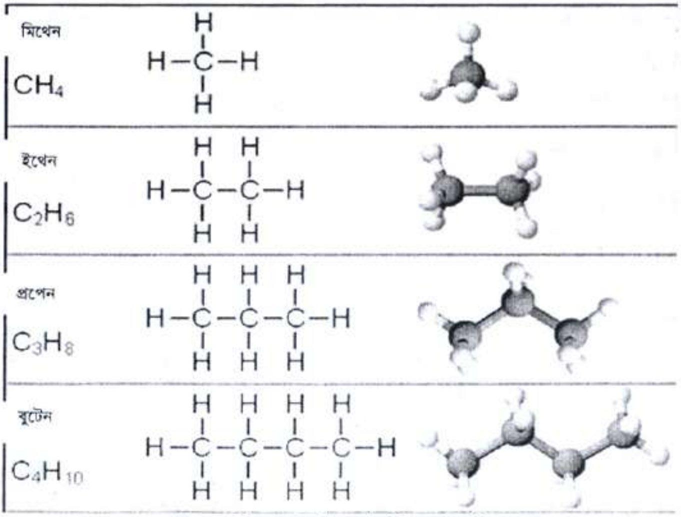

সরল হাইড্রোকার্বনগুলোর ফর্মুলা, গঠন চিত্র, ও ত্রিমাত্রিক মডেল

জীবদেহের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি ইত্যাদি তো বটেই; প্রাচীন জীবদেহ থেকে সৃষ্ট নানা বস্তু যেমন কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি ফসিল জ্বালানি এবং এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো অনেকগুলো এসেছে খনিজ তেল গ্যাসের প্রক্রিয়াকরণে নানা গবেষণা থেকে। দেখা গেছে খনিজ তেল ও গ্যাস হলো বিচিত্র কার্বন যৌগের একটি মিশ্রণ। এই যৌগগুলো সাধারভাবে শেকলের মত একের পর এক সাজানো কার্বন পরমাণু, অথবা কার্বন পরমাণুতে গড়া এক একটি রিং– উভয় ক্ষেত্রে এর বিভিন্ন কার্বন পরমাণুর সঙ্গে বাড়তি কিছু পরমাণুও যুক্ত থাকতে পারে। কার্বনের সঙ্গে শুধু হাইড্রোজেন যুক্ত থেকে এরকম অনেক যৌগ রয়েছে যাদের বলা হয় হাইড্রোকার্বন। এগুলোর কোন কোনটির মধ্যে শুধু একটি দুটি কার্বন পরমাণু থাকতে পারে, আবার কোনটি অনেক বেশি এমন কি ৫০টিরও বেশি। পরিশোধনের সময় খনিজ তেল থেকে এরকম অনেক হাইড্রোকার্বন যৌগগুলোকে পৃথক করা যায় আংশিক পাতন পদ্ধতিতে। যেমন সরলতম একটি কার্বন পরমাণু থেকে উর্দ্ধে ৪টি কার্বন পরমাণু নিয়ে তৈরি হয় কয়েকটি গ্যাস অণু – মিথেন, ইথেন, প্রপেন, বুটেন। মিথেনের ফরমুলা CH_4 বা ইথেনের C_2H_6 লিখলে চলে বটে, কিন্তু এতে অণুটির পুরো গঠনটি বুঝা যায়না– যা অর্গানিক যৌগের ক্ষেত্রে অনেক সময় জরুরী। তাই অণুতে পরমাণুগুলো কোনটির সঙ্গে কোনটি কী আকৃতি করে সংযুক্ত রয়েছে তা বুঝার জন্য অণুর গঠন চিত্রটি দিতে পারলে ভাল হয়। এটি বেশি জরুরি কারণ একই ফর্মুলা হয়েও অনেক সময় অর্গানিক যৌগ একেবারে ভিন্ন হতে পারে। যেমন ইথানোল এবং ডাই মিথাইল ইথার এই দুটারই ফর্মুলা C_2H_6O। শুধু গঠন চিত্র এদেরকে আলাদা ভাবে দেখাতে পারে, এবং এর রসায়নকে আরো স্পষ্ট করতে পারে। একই ফর্মুলার দুই বিভিন্ন গঠনচিত্রের কারণে দুই ভিন্ন অণুকে বলা হয় আইসোমার - একই উপাদানে তৈরি অথচ ভিন্ন ক্রমে সংযুক্ত।

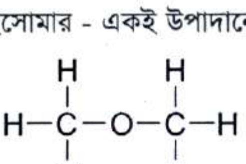

ডাই মিথাইল ইথার

C_2H_6O

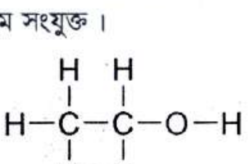

ইথানল

C_2H_6O

একই ফর্মুলা কিন্তু ভিন্ন গঠন

অর্গানিক যৌগের প্রকাশে আরো কিছু বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর কারণ অণু কিন্তু কাগজের সমতলে আঁকার মত চেপ্টা জিনিস নয় বরং ত্রিমাত্রিক

স্থানে থাকা একটি গঠন। অনেক সময় ত্রিমাত্রিক প্রকাশে এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকতে পারে। ত্রিমাত্রিক গঠনের মডেল বানিয়েই এগুলোর নিখুঁত প্রকাশ সম্ভব, অথবা বিশেষ গ্রাফিকস কৌশল অবলম্বনে কাগজ বা স্ক্রীনের উপরেই ত্রিমাত্রিক গঠন ফুটিয়ে তুলে।

খনিজ তেলে আরো বেশি সংখ্যক কার্বন পরমাণু দিয়ে গড়া যে যৌগগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে ৫টি অথবা ৬টি কার্বন পরমাণু যুক্ত গ্যাসোলিন, ৬টি থেকে ১০টি দিয়ে ন্যাপথা, ১০টি থেকে ১৬টি দিয়ে কেরোসিন, ১৬ থেকে ২০টি দিয়ে ডিজেল, ২০টি থেকে ৩০টি দিয়ে লুব্রিকেটিং অয়েল, ৩০টি থেকে ৪০টি দিয়ে ফুয়েল অয়েল, ৪০টি থেকে ৫০টি দিয়ে প্যারাফিন মোম, এবং ৫০টির উপরে বিটুমিন। বলা বাহুল্য এই শেষের অণুগুলো যথেষ্ট বড়। এই বড় অণুগুলোকে রাসায়নিক ভাবে ভেঙ্গে ছোট অণুগুলো তৈরি করা যায়। তাছাড়া এভাবে ভাঙ্গার মাধ্যমে ছোট অণুগুলোকে নূতন রূপ দেয়া যায় কিছুটা ভিন্ন যৌগতে। যেমন ইথেনকে এভাবে ভেঙ্গে ইথিন নামের ভিন্ন যৌগ তৈরি হতে পারে। এসব ভাঙ্গার কাজে সাধারণত উত্তাপ আর বিশেষ ক্যাটালিষ্ট ব্যবহার করা হয়। একই উপায়ে গঠন বদলিয়ে এক আইসোমারকে অন্য আইসোমারে পরিবর্তন করা যায়- যার ফলে মূলত একই কিন্তু কিছু নূতন গুণ সম্পন্ন যৌগ পাওয়া সম্ভব। এই কাজকে বলা হয় অণুর পুনর্গঠন।

এমনিভাবে খনিজ তেলের যৌগগুলো থেকে ভেঙ্গে অথবা পুনর্গঠন করে রসায়নবিদরা অদ্ভূত নানা গুণ সম্পন্ন বস্তু তৈরির গুরুর উপাদানটি পেতে পেরেছেন– যার মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্লাষ্টিকগুলো। প্লাষ্টিক অণুগুলোকে সাধারণত পলিমার দলভুক্ত করা যায়– যেগুলো সরল কোন অণুর একইটির বার বার পুনরাবৃত্তিতে লম্বা শেকল তৈরি করে তৈরি হয়। সরল অণুটিকে বলা হয় মনোমার। এভাবে আমরা ইথেনকে পুনর্গঠন করে যে ইথিন তৈরি হতে দেখেছি সেটিকে মনোমার হিসেবে নিয়ে তার বার বার পুনরাবৃত্ত শেকল রূপে তৈরি হয় যে পলিমার তা হলো পলি-ইথিন বা পলিথিন। পলিথিনের থলে, পলিথিনের দড়ি ইত্যাদি ছাড়া আজকাল কারোই চলেনা। এটি একটি প্লাষ্টিক।

মনোমার ইথিনের চেইন তৈরি করে পলিমার পলিথিন

এমনি প্লাষ্টিক হলো পলিপ্রোপিন যার মনোমার হলো প্রোপিন। এমনি ভাবে পলি ভিনাইল ক্লোরাইড, সংক্ষেপে যাকে আমরা পিভিসি বলে জানি তা অনেক ক্ষেত্রে লোহার পাইপকে সরিয়ে দিয়ে পিভিসি পাইপের যুগ এনেছে। আর একটি অতি পরিচিত প্লাষ্টিক হলো পলিষ্টিরিন– টেলিভিশন, ফ্রিজ ইত্যাদির নিরাপদ প্যাকেজ করার জন্য অহরহ যার ব্যবহার হচ্ছে; অথবা তাপ নিরোধী হট বক্স, কাপ ইত্যাদি তৈরিতে।

বিংশ শতাব্দীর রসায়নের একটি বড় অবদান হলো বিভিন্ন প্লাষ্টিক পলিমারগুলো কৃত্রিমভাবে সৃষ্টিতে বিজ্ঞানীদের সাফল্য। বার বার নানা ভাবে চেষ্টা করে গুরুত্বপূর্ণ প্লাষ্টিকগুলোর নির্মাণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পলিথিনের কথাই ধরা যাক। নানা পরীক্ষা নিরিক্ষায় ইথিনকে উচ্চ উত্তাপ ও উচ্চ চাপে নিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এর ভিত্তিতে পলিমার তৈরি করা গেছে যার চমৎকার প্লাষ্টিক গুণ রয়েছে: প্রয়োজনীয় উত্তাপ সহিষ্ণু, পাতলা রূপ দেয়া যায়, আবার শক্ত আসবাবও তৈরি হয়, পানিতে নষ্ট হয়না, ইত্যাদি। ইথিনের দুটি কার্বনের মধ্যে একটি ডাবল বন্ধন রয়েছে– যার মধ্যে একটি বন্ধন অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পলিমার কারার সময় এই দুর্বল বন্ধনটিতে যে দুটি ইলেকট্রন শেয়ার হয় বন্ধন বাতিল করে ঐ দুটি ইলেকট্রনকে অন্য কাজের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এই অন্য কাজটি হলো আর একটি অনুরূপ ইথিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শেকল তৈরি করা– এমনিভাবে দীর্ঘ পলিমারে প্লাষ্টিক গুণ সৃষ্টি হতে পারে। দীর্ঘ এই শেকলে ৫০,০০০টি পর্যন্ত কার্বন পরমাণু থাকতে পারে– অতি দীর্ঘ এই অণু। দীর্ঘ এই আঁশ সদৃশ অণুগুলো যখন কঠিন একটি বস্তুতে রূপ নেয় তখন উপযুক্ত উত্তাপে একে চটচটে তরলে পরিণত করা যায়, যাকে ঠাণ্ডা করে বিভিন্ন আকৃতি দেয়া যায়। এভাবে উত্তাপে নরম করে রূপ দেয়া যায় বলে এরকম অনেক পলিমারকে থার্মোপ্লাষ্টিক বলা হয়।

অর্গানিক ক্যামিষ্ট্রির আওতায় খনিজ তেলের নানা অংশ থেকে কৃত্রিম ভাবে তৈরি প্লাষ্টিক– পলিথিন, পলিপ্রোপাইলিন, পিভিসি, পলিষ্টিরিন ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নাইলন, পলিষ্টার ইত্যাদি বস্ত্র, বৈদ্যুতিক ব্যবহারের জন্য নানা রকম ইন্‌স্যুলেটর, গামলা, আসবাব, যন্ত্রপাতির কেইস ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত প্লাষ্টিক এগুলো এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে রসায়নের নানা কৌশলে। অন্যদিকে জৈব নানা বস্তু শর্করা, গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ফ্রুকটোজ ইত্যাদি সুগার, এলকোহল, উদ্ভিজ তেল, ইত্যাদির তৈরি, গুণাগুণ সৃষ্টি, এদের প্রক্রিয়াকরণে অন্য জরুরী ব্যবহার্য তৈরি অর্গানিক ক্যামিষ্ট্রির কাজ। আর জীবন রহস্যের যে রসায়ন তার আরো ঘনিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বায়োক্যামিষ্ট্রি বা প্রাণ রসায়ন – যার খানিকটা আমরা একটু পর দেখবো।

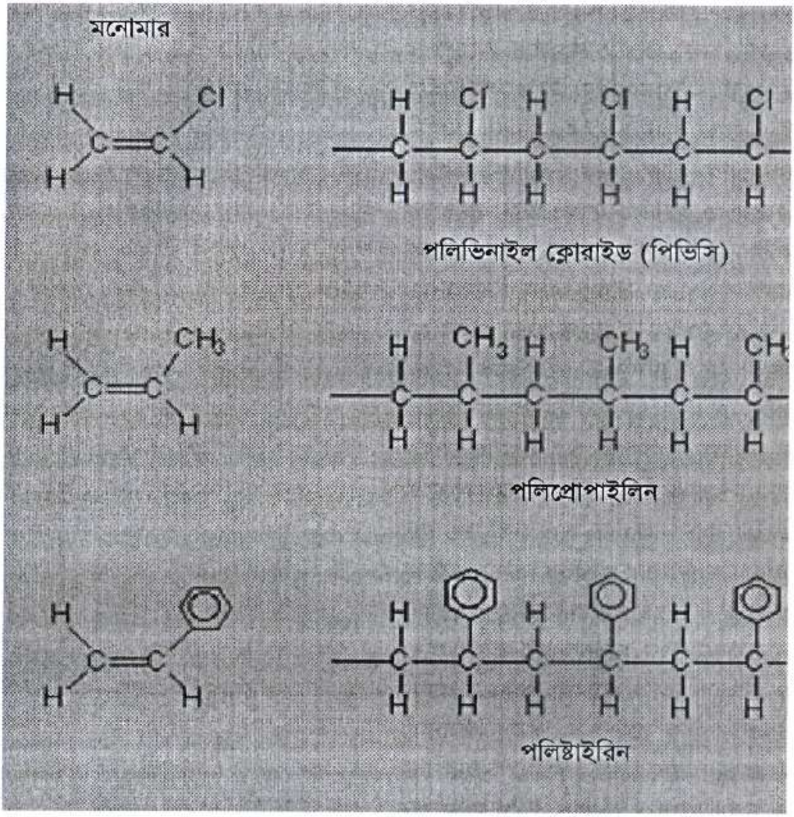

বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি পলিমারের গঠন

প্রকৃতিতে থাকা অণু কৃত্রিম ভাবে তৈরি

আমাদের অনেক জরুরী বস্তু প্রকৃতি থেকে আসে। এদের অণু-গঠন ইত্যাদি উদ্ঘাটন বিজ্ঞানের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। আরো বড় চ্যালেঞ্জ হলো এদের অণুকরণে একই বস্তু সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ বা অংশত কৃত্রিম ভাবে। এর প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি হয় জীবন রক্ষাকারী ওষুধের ক্ষেত্রে। এগুলোর অধিকাংশই নানা জীব বা জৈব বস্তু থেকে স্বাভাবিক ভাবে আসে– যে সব অণু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ক্যানসার কোষ ইত্যাদির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতিতে এদের সব কটি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়না, সেখান থেকে সংগ্রহ ব্যয়বহুল হয়, তা ছাড়া প্রকৃতিতে এদেরকে বিশুদ্ধ ভাবে পাওয়া যায়না, উপকারী অংশের সঙ্গে অপকারী অংশও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সব দিক থেকে ভাল হয় যদি ঠিক যে অণুটি দরকার তাকে যদি রাসায়নিক ভাবে তৈরি করে নেয়া যায়

সহজলভ্য উপাদান থেকে। এই কাজটিকে বলা হয় অণুর সিনথেসিস বা সংশ্লেষণ। আধুনিক বিজ্ঞানের বড় সাফল্য হলো বেশ কিছু জটিল জীবন রক্ষাকারী অণুর সংশ্লেষণ। এই সাফল্যের নিত্য নূতন সংবাদ বিশেষ করে চিকিৎসাবিদ্যায় সুখবর নিয়ে আসে।

সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ যে কুইনিন পাওয়া যেত তার সংশ্লেষণ করতে গিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা প্রথম কৃত্রিম রঙ আবিষ্কার করেছিলেন, আলকাতরার কিছু উপাদান থেকে। এরকম একটি উপাদান এনিলিনের সঙ্গে কুইনিনের সাদৃশ্য থাকাতে সেটিকে ভিত্তি করে চেষ্টা চলছিল। সে সময় সংশ্লেষণের সঠিক পদ্ধতি ভাল জানা ছিলনা, অনেকটা আন্দাজের উপর ভিত্তি করে ঐ উপাদানটিতে গঠনচিত্রের শাখা-প্রশাখায় পরিবর্তন ঘটিয়ে কুইনিনের অনুরূপ অণু পাওয়ার চেষ্টা চলছিল। এতে সফল না হলেও কিছুটা কাকতালীয় ভাবে পাওয়া গিয়েছিল কৃত্রিম বেগুনি রঙ। এরপর এমনি ভাবে এসেছে আরো নানা কৃত্রিম রঙ– এর কোন কোনটির রঙ হওয়া ছাড়াও আরো গুণাগুণ ছিল, যেমন কোন কোনটি জীবাণুনাশক হিসেবেও। ও সময় এরকম কৃত্রিম রঙের খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক শিল্প গড়ে উঠেছিল যা বস্ত্র শিল্পকে ও দুর্লভ প্রাকৃতিক রঙের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু কুইনিন শেষ পর্যন্ত সফলভাবে সংশ্লেষিত হতে পেরেছিল এর অনেক দিন পর ১৯৪৪ সালে। এর পর থেকে আর সিকোনা গাছের উপর নির্ভর করতে হয়নি।

পরবর্তী সময় সংশ্লেষণের পদ্ধতির অনেক উন্নতি হয়েছে। যেমন একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ নেয়া যাক ক্যানসারের ওষুধ ট্যাক্সলের। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে পাওয়া যায় ইউ গাছ যার থেকে স্বল্প পরিমাণে এই ওষুধটি আসতো। এর অণুটির গঠন অত্যন্ত জটিল। একে সংশ্লেষণের জন্য যে কৌশল উদ্ভাবিত হলো তাকে বলা হলো রিট্রো-সিনথেসিস তার মানে উল্টো দিকে গিয়ে সংশ্লেষণ। একেবারে শেষে চূড়ান্ত যেই ট্যাক্সলকে পেতে চাই তার অণুর থেকে শুরু করে পেছনের দিকে কী কী তাতে পরিবর্তন করলে সহজলভ্য কোন কোন অণু হিসেবে পাওয়া যায় তা দেখা হলো। এ যেন চূড়ান্ত লক্ষ্যের কাছাকাছি কোন কোন উপাদান বাজারে তখনই পাওয়া যায় তা দেখা, এবং সেভাবে ওগুলোকে সংশ্লেষিত করা।

আধুনিক সংশ্লেষণে কতগুলো জিনিস লক্ষ্য করতে হয়। ঐ যে সহজলভ্য উপাদানগুলোর কথা বলা হলো এগুলো হতে পারে কিছু পরমাণু-গ্রুপ যারা নিজেরা বিশেষ বিশেষ গুণ বহন করে এবং নানা রকম জটিলতর অণুর অংশ হয়ে থাকে। তাদেরকে সংশ্লেষণের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আর একটি বিষয়ের কথা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে সেখানে অণুর বা গ্রুপের ত্রিমাত্রিক

গঠনের কথাটি মনে রাখতে হয়। এরকম একই রকম অণুর ভিন্ন ভিন্ন ত্রিমাত্রিক রূপ থাকতে পারে যেগুলো একটির উপর আরেকটি হুবহু স্থাপন করা যাবেনা– যেমন আমাদের বাম হাতের উপর ডান হাতকে হুবহু স্থাপন করা যায়না। এই পার্থক্যের কারণে রাসায়নিক গুণের তফাত হয় যা সংশ্লেষণের সময় মনে রাখতে হয়। এই ত্রিমাত্রিক পার্থক্যগুলো আমলে নিয়ে যে রসায়ন তাকে বলা হয় ষ্টিরিও-ক্যামিষ্ট্রি। প্রকৃতিতে অনেক সময় ত্রিমাত্রিক পার্থক্য সম্পন্ন এমন অণু পাওয়া যায় যার একটি আর একটির আয়নার প্রতিফলনের মত (বাম হাতের প্রতিফলন যেমন ডান হাত)। উভয়ের অর্ধেক-অর্ধেক সংমিশ্রণ সেখানে থাকে। অনেক সময় এরা পোলারাইজড আলোকে ডান দিকে অথবা বাম দিকে ঘোরাতে পারে বলে এদের একটিকে ডান হাতি ও অন্যটিকে বাম হাতি বলা যায়। কৃত্রিম সংশ্লেষণে যদি এদের একটিই শুধু থাকে তা হলে অন্তত ওষুধের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিণতি হতে পারে। ১৯৬০ এর দশকে থ্যালিডোমাইড নামক একটি অচেতনকারী নূতন ওষুধ গর্ভবতী মায়েরা খাওয়ার পর তাদের বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মেছে অনেকের ক্ষেত্রে। এর কারণ দেখা গেছে প্রাকৃতিক ওষুধের সঙ্গে কৃত্রিম ওষধের শুধু বাম হাতি- ডান হাতি হওয়ার ব্যাপারে প্রভেদ হওয়াতেই এত বড় দুর্ঘটনাটি ঘটতে পেরেছে। উপরে ক্যানসার নাশক ওষুধ ট্যাক্সলের যে সংশ্লেষণের কথা বলা হয়েছে তাতে যথার্থ ভাবে বাম হাতি বা ডান হাতি অণু গড়ে তোলার কৌশলটি চমৎকার ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন ওষুধ, হরমোন, ইত্যাদি নানা জটিল অণুর সংশ্লেষণ বিজ্ঞানীরা নিয়মিত ভাবে করতে পারছেন বলেই এগুলো সবাই সহজলভ্য ভাবে পাচ্ছে। নইলে মূল প্রাকৃতিক উৎসের উপর নির্ভর করলে চিকিৎসাবিদ্যার এরকম উন্নয়ন আদৌ সম্ভব হতোনা।

অণু-গঠন নির্ণয়ে আধুনিক কৌশল

এক্সরে ক্রীষ্টালোগ্রাফি

রাসায়নিক আচরণের ভিত্তিতে তাত্ত্বিক হিসেব নিকেষ থেকেই শুরুতে অণু-গঠন নির্ণয়ের কাজ চলেছে। পরবর্তীতে এমন সব জটিল অণুর গঠনে হাত দেয়া হয়েছে যে আরো কৌশলী উদ্ঘাটন পদ্ধতি উদ্ভাবিত না হলে যার উদ্ঘাটন প্রায় অসম্ভব হতো। আধুনিক এই কৌশলগুলো বেশ কিছু দিন ধরে ব্যবহৃত হলেও সাম্প্রতিক কালে এদের কার্যকারিতায় অভাবনীয় রকমের উন্নতি হয়েছে। ফলে রসায়নে বিশেষ করে জৈব রসায়নে অত্যন্ত জটিল ও বড় সব অণুর গঠনও শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের হাতে ধরা দিয়েছে– এখনো নিত্য নূতন চ্যালেঞ্জ তাঁরা গ্রহণ করতে পারছেন। কৌশলগুলোর মধ্যে এক্সরে ক্রীষ্টালোগ্রাফি অপেক্ষাকৃত পুরানো। বিভিন্ন প্রোটিন এবং ডিএনএ'র অতি গুরুত্বপূর্ণ অণুর গঠন আবিষ্কারেও এটি প্রধান ভূমিকা রেখেছেন পঞ্চাশের দশক থেকে।

যে সব অণু কঠিন অবস্থায় ক্রীষ্টাল অর্থাৎ স্ফটিক গঠন করে সেগুলোর ক্ষেত্রে এক্সরে কৌশলটি কাজে লাগে। ক্রীষ্টালে অণুগুলো সুশৃঙ্খল ভাবে সাজানো থাকে – সব দিকেই সুনির্দিষ্ট দূরত্বে পর্যায়ক্রমে একটি করে অণু পাওয়া যায়। তাই যে কোন দিক থেকে অণুতে গড়া তল পাওয়া যাবে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর পরস্পর সমান্তরাল ভাবে। উৎস থেকে এক্সরে' রশ্মি যদি ঐ দিকে এসে ক্রীষ্টালের উপর পড়ে তা হলে পর পর দুটি তল থেকে প্রতিফলিত এক্সরে তরঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে ইন্টারফেরেন্স করে কোথাও আলো কোথাও কালো পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। এভাবে প্রতিফলিত এক্সরে যদি ওখানে রাখা ফটো ফিল্মের উপর এসে পড়ে তাহলে তাতে সুনির্দিষ্ট জায়গায় ফোটা বা রেখা সৃষ্টি করবে। তরঙ্গের এরকম ইন্টারফেরেন্স করার গুণ আমরা এই সিরিজের প্রথম বইয়ে দেখেছি।

ব্র্যাগের নিয়ম নামক একটি নিয়মে বিভিন্ন তলের পরস্পর দূরত্বের সঙ্গে ফোটাটি বা রেখাটি ফটো ফিল্মের কোথায় পড়বে তার একটি কৌণিক সম্পর্ক পাওয়া যায়। ক্রীষ্টালটি ক্রমাগত ঘুরিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে এক্সরে ফেললে ফিল্মের উপর এমনি ফোটার একটি প্যাটার্ন ফুটে উঠে। ফিল্মের ফোটাগুলোর প্যাটার্ন থেকে ক্রীষ্টালের বিভিন্ন দিকে অণুতে গড়া তলগুলোর মধ্যে দূরত্ব হিসেব করে বের করা যায়। তাছাড়া এক্সরে নিজে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ হওয়াতে এটি প্রত্যেক পরমাণুর ইলেকট্রন মেঘের সঙ্গে আন্তক্রিয়া করে এবং সেখান থেকে

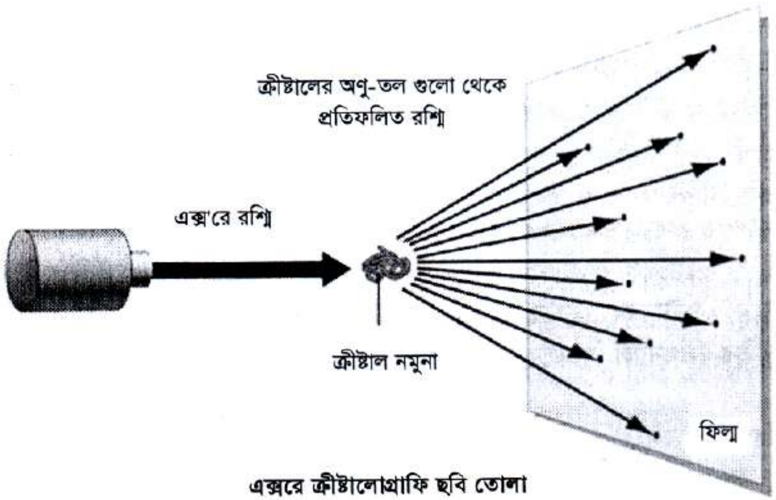

এক্সরে ক্রীষ্টালোগ্রাফি ছবি তোলা

সুনির্দিষ্ট নিয়মে বিক্ষিপ্ত হয়। প্রতিফলিত নানা ফোটা বা রেখার ফটো ঘনত্ব এক্সরের এই বিক্ষেপনের উপর নির্ভর করবে। ঐ ঘনত্বের পরিমাপ করে তার বন্টন থেকে জটিল গাণিতিক উপায়ে অণুর নানা অংশে নানা পরমাণুতে ইলেকট্রন মেঘের বন্টনেরও হদিশ মেলে। এর অর্থ অণুর বিস্তারিত গঠনটিও এর মাধ্যমে বেশ খানিকটা উদ্ঘাটিত হয়। অনেক সময় বিজ্ঞানীরা পুরো বিশ্লেষণের আগে এক্সরে ফটোর দিকে তাকিয়েই অণুর গঠনের বিষয়গুলো মোটা দাগে বুঝতে পারেন। মহিলা বিজ্ঞানী রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিনের তোলা ডিএনএ ক্রীষ্টালের এক্সরে ছবি দেখে ফ্রান্সিস ক্রীক ও জেমস ওয়াটসন এভাবেই ডিএনএ'র গঠন আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। এই কাজের জন্য তাঁরা সবাই চিরস্মরণীয় হয়েছেন। জটিলতর অণুর ক্ষেত্রে এক্সরে ফটোতে ফোটা বা রেখার ঘনত্বের বন্টনকে অণুতে পরমাণুর বিন্যাসে রূপ দেয়ার কাজটিতে অনেক দীর্ঘ ও জটিল অংক কষার প্রয়োজন হয় যা শক্তিশালী কম্পিউটার ছাড়া করা সম্ভব নয়। এখন কম্পিউটার সক্ষমতা অনেক বেড়ে যাওয়া খুব জটিল অণুর ক্ষেত্রেও এভাবে

ডিএনএ'র গঠন আবিষ্কারের পেছনে কাজ করেছে এই ঐতিহাসিক এক্স'রে ক্রীষ্টালোগ্রাফি ছবি

অণু-গঠন নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে এক্সরে ক্রীষ্টালোগ্রাফির মাধ্যমে।
দক্ষ নির্ণয়ের জন্য ঐ অণুগুলোকে পুরো নমুনাটি একটি নিরবিচ্ছিন্ন একক ক্রীষ্টাল হিসেবে পেলে ভাল হয়- যাকে বলা হয় সিঙ্গেল ক্রীষ্টাল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অণুকে পাওয়া যায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীষ্টালের এলোমেলো ভাবে থাকা সমাবেশ হিসেবে যাকে বলা হয় পলি-ক্রীষ্টাল। ওরকম কঠিন বস্তুকে গুড়িয়ে পাউডার করে তা দিয়ে নমুনা তৈরি করলে পলি-ক্রীষ্টাল থেকেও অণু-গঠন নির্ণয় করা সম্ভব হয়। ফটো ফিল্মের সাহায্যে ফোটা বা রেখার উদ্ঘাটন না করে ইলেকট্রনিক উদ্ঘাটকের সাহায্যেও তা করা যায় আরো সুন্দর ভাবে, যেখানে ফোটা বা রেখার অবস্থান, ঘনত্ব ইত্যাদি ফটোর বদলে সরাসরি বৈদ্যুতিক সিগন্যাল হিসেবে পাওয়া সম্ভব।

আলোক বর্ণালি

সাদা আলোকে বেগুনি থেকে লাল পর্যন্ত নানা রঙে অর্থাৎ নানা ফ্রিকোয়েন্সির আলোতে বিভক্ত করে বেনিআসহকলা বর্ণালিকেই আমরা সবাই ভাল চিনি। এটি শুধু দৃশ্য আলোর বর্ণালি। ডানে বামে দুদিকেই একে ছাড়িয়ে আলোর অদৃশ্য অংশগুলোও অণুর গঠন নির্ণয়ে কাজে আসে। বেগুনি আলোর থেকেও বেশি ফ্রিকোয়েন্সির আলট্রা ভায়োলেট আর লাল আলোর চেয়েও কম ফ্রিকোয়েন্সির ইনফ্রারেড ও মাইক্রোওয়েভ বর্ণালির এসব অংশও খুব কাজে লাগে। এক এক অংশে এর কারণ এক রকম।
আলট্রা ভায়োলেট ও দৃশ্য আলোর ক্ষেত্রে আলোর বিক্রিয়া ঘটে পরমাণুর ইলেকট্রন মেঘ অংশের সঙ্গে। সিরিজের আগের বইয়ে পরমাণুর গঠন চিত্রের আলোচনায় আমরা দেখেছি আলো কী ভাবে পরমাণুতে শোষিত হয়ে ইলেকট্রনকে নিম্ন শক্তি অবস্থা থেকে উচ্চ শক্তি অবস্থায় নিয়ে যায়। আবার উচ্চ শক্তি অবস্থা থেকে নিম্ন অবস্থায় নেমে আসার সময় দুই অবস্থার শক্তি পার্থক্য অনুযায়ী খুবই সুনির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির আলো নির্গত করে – যাদের মাধ্যমে সেই পরমাণুর উপস্থিতি সনাক্ত করা যায়। কোন অণুতে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির আলট্রা ভায়োলেট বা দৃশ্য আলোর শোষণের গ্রাফ থেকে বিভিন্ন পরমাণু, এর বন্ধনের প্রকৃতি- যেমন ডাবল বন্ধন না সিঙ্গেল বন্ধন, বিশেষ বিশেষ পরমাণুগ্রুপের উপস্থিতি, ইত্যাদি নির্ণয় করা সম্ভব।
তবে অণু সম্পর্কে সব চেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া যায় বর্ণালির ইনফ্রারেড অংশ থেকে। অণু সব সময় কাঁপছে, স্প্রিং এর মত বার বার লম্বা-বেঁটে হচ্ছে, মোচড় খাচ্ছে – ইত্যাদি বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে ঘটছে। এ সব স্পন্দনে যে রকম শক্তি মাত্রা ব্যবহৃত হয় তা সাধারণত ইনফ্রারেডের ফ্রিকোয়েন্সির আওতায় পড়ে।

প্রত্যেক অণুর এ সব স্পন্দনের প্রত্যেকটির নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি থাকে– ঠিক ঐ ফ্রিকোয়েন্সির আলো এর গায়ে পড়লে তা সহজে শোষিত হয়। যেমন পানির অণুর স্পন্দন মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সির বলে ঐ ফ্রিকোয়েন্সির বিকিরণে পানির অণুকে উত্তেজিত করা যায়– যার ফলে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে খাদ্য বস্তুর ভেতরের পানিকে উত্তপ্ত করে তোলা যায়। অণুর স্পন্দনের কী ফ্রিকোয়েন্সি হবে তা এর মধ্যে পরমাণু বন্ধনের প্রকৃতি, বিশেষ পরমাণুগুলোর ভর ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। ইনফ্রারেড বর্ণালি তাই অণুর স্পন্দন ফ্রিকোয়েন্সির খবর দিয়ে এসব বন্ধন, ওখানে উপস্থিত পরমাণু গ্রুপ ইত্যাদি সম্পর্কে জানাতে পারে। যেমন C=O এই বন্ধন বর্ণালিতে যে ফ্রিকোয়েন্সিতে তীব্র শোষণ দেখাবে C–O এই বন্ধন তা দেখাবে অন্য ফ্রিকোয়েন্সিতে। বর্ণালিতে ঠিক ঐ জায়গায় তীব্র শোষণ দেখে আমরা বুঝবো যে অণুতে C=O আছে কি নেই। ধরা যাক একটি অণুতে ২টি CO গ্রুপ রয়েছে। আমরা জানতে চাই গ্রুপ দুটা পরস্পর সমকোণে আছে না সোজাসুজি ১৮০° কোণ করে আছে। এর উপর অণুগঠন চিত্র অনেকখানি নির্ভর করে। ইনফ্রারেড বর্ণালিতে যদি দুটি ব্যান্ড দেখা যায় তা হলে বুঝতে হবে গ্রুপ দুটি সমকোণে রয়েছে, আর একটি ব্যান্ড দেখা গেলে বুঝতে হবে এই দুটি সোজাসুজি রয়েছে।

ইনফ্রারেড বর্ণালি দেখে অণু গঠনের এরকম অনেক কিছু মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। তবে খুব সূক্ষ্ম হিসেব করে একেবারে পরিমাণগত ফলাফল পাওয়া এক্ষেত্রে একটু দুরূহ হয় কারণ ইনফ্রারেডের শোষণের তীব্রতা খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা যায়না।

ম্যাস স্পেকট্রোস্কোপি

ম্যাস স্পেকট্রোস্কোপি হলো বিদ্যুৎ-চৌম্বক ব্যবস্থায় সরাসরি অণুর বিভিন্ন অংশের ভর নির্ণয় করা। এতে নমুনার অণুগুলোকে বাষ্পীয় অবস্থায় আনা হয় যার মধ্যে অংশগুলো আয়ন হিসেবে অর্থাৎ চার্জ সম্পন্ন টুকরো হিসেবে থাকে। এগুলোকে যদি এখন বৈদ্যুতিক আকর্ষণের মাধ্যমে গতি দেয়া হয় এবং চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হয় তা হলে যার যার ভর অনুযায়ী বেঁকে গিয়ে এরা বিভিন্ন স্থানে উপনীত হবে। যদি গমন পথটি সুনির্দিষ্ট রেখে চৌম্বক ক্ষেত্রটি ক্রমাগত বাড়াতে থাকি তাহলে আয়নের ভর অনুযায়ী বিশেষ ভরের টুকরাগুলো চৌম্বক ক্ষেত্রের শুধু বিশেষ বিশেষ তীব্রতায় হুবহু ঐ যাত্রাপথের অনুসরণ করে উদ্ঘাটকে এসে হাজির হবে– আয়ন টুকরার সংখ্যা অনুযায়ী প্রত্যেকটির উদ্ঘাটনের সিগন্যালের তীব্রতাও কম-বেশি হবে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে দ্রুত আমরা জেনে ফেলবো ঐ নমুনায় কী কী ভরের পরমাণু বা পরমাণু গ্রুপ রয়েছে।

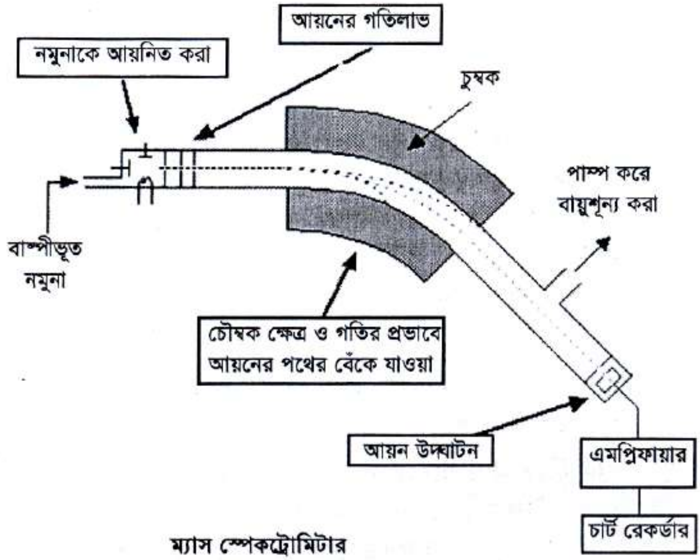

ম্যাস স্পেকট্রোমিটার

শুরুতে সাধারণ অজৈব রসায়নে ম্যাস স্পেকট্রোস্কোপি প্রচুর ব্যবহৃত হলেও প্রোটিনের মত নাজুক জৈব অণুর ক্ষেত্রে এভাবে বাষ্পীভূত করার সময় অণুর গঠন অবিকৃত রাখা কঠিন হতো। এজন্য ওগুলোর ক্ষেত্রে ম্যাস স্পেকটোগ্রাফি ব্যবহার করা যেতো না।

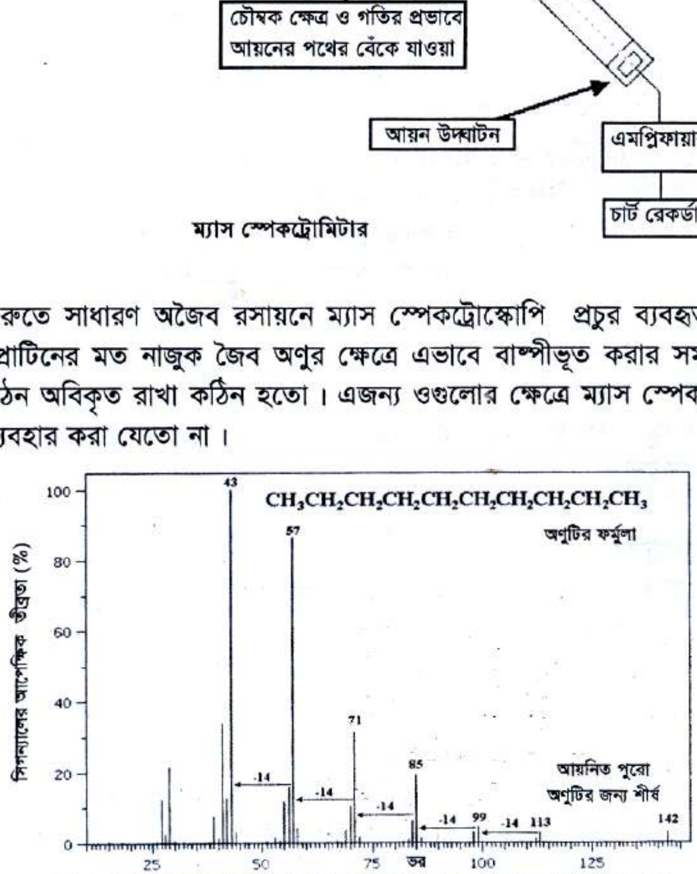

ম্যাস স্পেকট্রোস্কোপির চার্টের বিভিন্ন শীর্ষ অণুর বিভিন্ন অংশের (ভর অনুযায়ী) তুলনামূলক উপস্থিতি নির্দেশ করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি করে CH_2 গ্রুপ ভেঙ্গে চলে যাওয়াতে ১৪ করে করে ভর কমেছে টুকরার, যা CH_2 এর ভর।

এখন অবশ্য এক ধরনের সূক্ষ্ম স্প্রে'র সাহায্যে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সহায়তায় প্রোটিনযুক্ত দ্রবণকে এমনভাবে কুয়াশার মত অবস্থায় নেয়া যায় যার মধ্যে অবিকৃত প্রোটিনের টুকরা আয়ন অবস্থায় থাকে। একে ম্যাস স্পেকট্রোস্কোপি করার জন্য ব্যবহার করা যায়। যেমন একটি প্রোটিন অণুর ক্ষেত্রে আমরা জানতে চাইতে পারি কী কী এমাইনো এসিড গ্রুপ দিয়ে অণুটি গঠিত হয়েছে। মোট ২০টি এমাইনো এসিডের মধ্য থেকে কিছু কিছু এখানে কোনটির পর কোনটি শেকলের আকারে থাকছে তার উপরেই প্রোটিন অণুর পরিচয় নির্ভর করছে। এই এমাইনো এসিড ক্রমের উপরেই শেষ পর্যন্ত প্রোটিনের আসল জটিল গঠন নির্ভর করে।

এন এম আর

এন এম আর এই যন্ত্রটি এখন রসায়নবিদের নিত্য বন্ধু। রীতিমত জটিল অণুতে নানা রকম পরমাণু-বন্ধনের জাল সদৃশ গঠন উদ্ঘাটনে, খুব কাছাকাছি পরমাণুকে আলাদাভাবে চিনতে, একটি পরমাণুর জন্য অণুর ভেতরে কী রকম পারিপার্শ্বিকতা রয়েছে এবং তাতে কী পরিবর্তন ঘটছে এসব সূক্ষ্ম ভাবে জানার জন্য এন এম আর এর জুড়ি নেই। রসায়নবিদদের বাইরেরও অনেকে এন এম আরকে তার অন্য নামে খুবই চেনেন– সেটি হলো অনেক রকম রোগ নির্ণয়ের অমোঘ পদ্ধতি হিসেবে সব ডায়গোনিষ্টিক সেন্টারে যা রয়েছে সেই এম আর আই। এন এম আর ও এম আর আই আসলে একই যন্ত্র, একই পদ্ধতিতে কাজ করে।

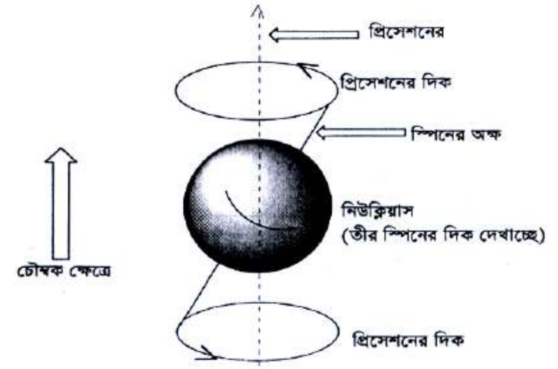

এন এম আর ব্যবস্থায় নিউক্লিয়াসের স্পিনের অক্ষটির প্রিসেশন ঘূর্ণন

এন এম আর কথাটির বিশদ রূপ হলো নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স। এখানে মূল ঘটনাটি ঘটছে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে। কোন কোন নিউক্লিয়াসে,

যেমন কোন মৌলের বিশেষ কোন আইসোটোপে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা এমন থাকে যে এদের স্পিন (ঘূর্ণনের পরিমাপ) যোগ-বিয়োগ করে নিউক্লিয়াসের নিজস্ব একটি স্পিন থাকে– অর্থাৎ আমরা মনে করতে পারি যে নিউক্লিয়াস নামক এই চার্জযুক্ত কণিকাটি নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে। এমনটি ঘূর্ণায়মান চার্জ একটি কারেন্টের মত কাজ করে বলে তা ক্ষুদ্র একটি চুম্বকের মত (চুম্বক-দন্ডের মত) পরিগণিত হবে। আমাদের নমুনায় এরকম নিউক্লিয়ার চুম্বক যতগুলো থাকবে সাধারণভাবে এরা ইতস্তত নানা দিকে ঘুরানো-ফিরানো থাকবে। এখন একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে এই ক্ষুদ্র চুম্বকগুলো সেটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই ক্ষেত্রের সঙ্গে একই দিকে আসার চেষ্টা করবে। পুরো নমুনাটাই এভাবে একই দিকে একটি সম্মিলিত চৌম্বক ক্ষেত্র লাভ করে– যাকে বলা হয় স্যাম্পল ম্যাগনেটাইজেশন বা নমুনা চুম্বকত্ব। শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রটি সরিয়ে নিলে পরমাণুর স্বাভাবিক কম্পন নানা নিউক্লিয়াসের ক্ষুদ্র চুম্বকগুলোকে আবার ধীরে ধীরে এলোমেলো করে দিতে থাকবে এবং একটি সময় পর গিয়ে এগুলো আবার পূর্ববৎ পুরো ইতস্তত অবস্থায় চলে যাবে। একই দিকে সুসংহত চুম্বকগুলো পূর্ববৎ অবস্থায় ফিরে যেতে যে সময় লাগে তাকে বলা হয় রিল্যাক্সেশন টাইম। রিল্যাক্সেশন টাইম পরিমাপ করে বুঝা যায় যে ঐ নিউক্লিয়াসগুলো কত সহজে ঘুরতে পারে, যা থেকে তার পরিবেশ বুঝা যায়।

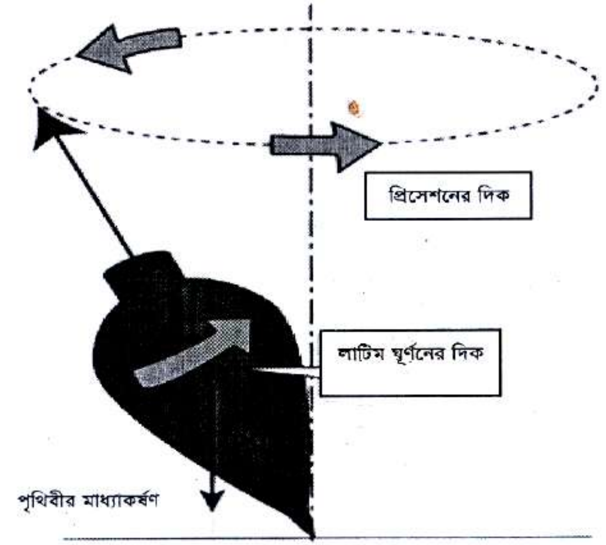

লাটিমের প্রিসেশন। এন এম আর এর ক্ষেত্রে লাটিমের বদলে ঘূর্ণায়মান নিউক্লিয়াস, এবং মাধ্যাকর্ষণের বদলে প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র

শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্রটি যখন প্রয়োগ করা হয় ঐ ক্ষেত্রের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে নিউক্লিয়াসটি নিজের অক্ষের উপর ঘুরে বটে (স্পিন) কিন্তু এর মধ্যেই তার অক্ষটি এই ক্ষেত্রের চারিদিকে অন্য একটি ধীর গতিতে পাক খেয়ে ঘুরতে থাকে – যাকে বলে প্রিসেশন। লাটিম বনবন করে ঘুরার সময়ও এই ব্যাপারটি আমরা লক্ষ্য করি। লাটিম কিন্তু তার অক্ষটি সোজা উপরের দিকে খাড়া করে স্থির রেখে ঘুরেনা, বরং তার অক্ষটিও একটু কাৎ হয়ে খাড়া দিকের চারিদিকে দিক পরিবর্তন করে ঘুরতে থাকে– যেটি লাটিমের প্রিসেশন। নিউক্লিয়াসের প্রিসেশনের একটি উচ্চ নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি থাকে। এখন ওখানে যদি একটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ (রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি) প্রয়োগ করা হয় যেটিও একটি ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্রের মত কাজ করে এবং তাই ঐ নিউক্লিয়াসের প্রিসেশনের সঙ্গে আন্তক্রিয়া করবে। বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গটি আর নিউক্লিয়াসের প্রিসেশন উভয়ের ফ্রিকোয়েন্সি যখন হুবহু এক হবে তখন উভয়ের মধ্যে রিজোনেন্স বা অনুরণন ঘটার ফলে নিউক্লিয়াসটি জোরালো ভাবে ঐ বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ শোষণ করবে যার ফলে এর চুম্বকত্বটি ঘুরে উল্টো দিকে চলে যাবে– তখনো সেই প্রযুক্ত শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্রটির সমান্তরাল থাকবে কিন্তু অভিমুখটি আগেরটির বিপরীত। আমরা যদি বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সিটি ক্রমাগত বাড়াতে থাকি, যেই মুহূর্তে সেটি রিজোনেন্সের অবস্থায় আসবে তখুনি চুম্বকত্ব দিক উল্টে যাবার ব্যাপারটি ঘটবে, সঙ্গে সঙ্গে শোষণের কারণে বিদ্যুৎ চৌম্বক সিগন্যালটি লাফিয়ে উঠে একটি শীর্ষ (পীক) দেখাবে।

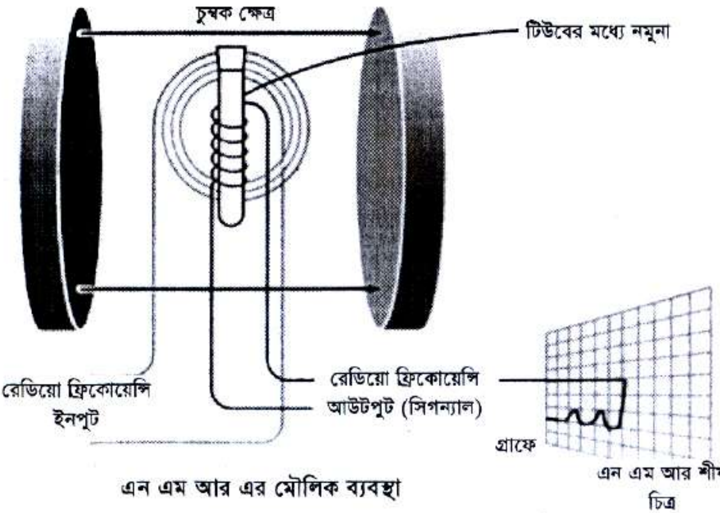

এন এম আর এর মৌলিক ব্যবস্থা

এন এম আর শীর্ষ চিত্র

শোষণ যত তীব্র হবে শীর্ষটি তত উঁচু হবে। কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে রিজোনেন্স হবে, অর্থাৎ শীর্ষটি কোথায় পাওয়া যাবে তা নির্ভর করবে একদিকে শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্রটির কত জোরালো তার উপর, এবং অন্যদিকে নিউক্লিয়াসটির নানা অবস্থার উপর। প্রযুক্ত চুম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা যেহেতু জানা থাকে কাজেই শীর্ষের অবস্থান দেখে নিউক্লিয়াসের পরিস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

বিভিন্ন অণুতে এন এম আর ব্যবহার করার মত কোন না কোন নিউক্লিয়াস প্রায়শ পাওয়া যায়– কারণ কোন কোন মৌলের স্বাভাবিক আইসোটোপের চৌম্বক গুণ না থাকলেও অন্য কোন আইসোটোপের থাকতে পারে এবং নমুনায় মৌলটির কোন কোন পরমাণু সেই আইসোটোপের হতে পারে। যেমন অর্গানিক যৌগের ক্ষেত্রে এন এম আর অহরহ ব্যবহৃত হচ্ছে প্রধানত তাতে কার্বন-১৩ এবং হাইড্রোজেন অবশ্যই থাকার সুযোগ নিয়ে, কারণ এই দুই নিউক্লিয়াসেই সামগ্রিক স্পিন রয়েছে, যে কারণে এরা ক্ষুদ্র চুম্বক। এই কার্বন নিউক্লিয়াসগুলোর বিভিন্নটির পরিবেশে যে ইলেকট্রন মেঘ তাদের বন্টনে পার্থক্য থাকলে বিভিন্ন পরিবেশযুক্ত নিউক্লিয়াসের রিজোনেন্স বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে হবে, তাই বিভিন্নটির জন্য গ্রাফে বিভিন্ন জায়গায় শীর্ষ পাওয়া যাবে – যা দেখে প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাবে। একই ঘটনা বিভিন্ন হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রেও ঘটবে। নিউক্লিয়াসের পরিবেশ যতটি বিভিন্ন রকমের হবে, দেখা যাবে ততটি বিভিন্ন শীর্ষ –এরকম নানা জায়গায় শীর্ষ সরে যাওয়ার পরিমাণকে বলা হয় ক্যামিকাল শিফ্‌ট। বিভিন্ন পরিবেশে রিজোনেন্স ভিন্ন হবার কারণ হলো ইলেকট্রন নিজেরাও কিন্তু ক্ষুদ্র চুম্বক– তাদের চৌম্বক ক্ষেত্র নিউক্লিয়াসের চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা কিছুটা আড়াল হয়ে যায়– আর ইলেকট্রনের বন্টন অনুযায়ী এই আড়াল হওয়ার প্রকৃতি ভিন্ন হওয়াতে নিউক্লিয়াসের চৌম্বকত্ব কার্যত কিছুটা ভিন্ন হবে।

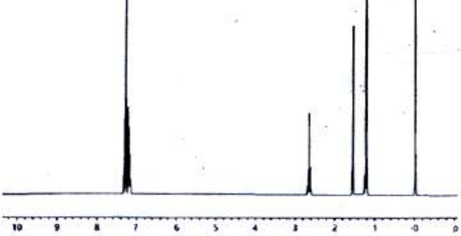

এন এম আর এর ফলাফল সিগন্যালের শীর্ষগুলো

একটি উদাহরণ নেয়া যাক। ইথানোল অর্থাৎ ইথাইল এলকোহলের রাসায়নিক ফর্মুলা হলো CH_3CH_2OH। এর হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের যে এন এম আর ফলাফল হাইড্রোজেন ৬টি হলেও তাতে মাত্র তিনটি শীর্ষ দেখা যায়

একটি CH_3 একটি CH_2 ও একটি OH গ্রুপের জন্য। CH_3 গ্রুপে থাকা তিনটি হাইড্রোজেনের পরিবেশ একই বলে এই তিনটির জন্য একই শীর্ষ এক্ষেত্রে রিজোন্যান্সের সময় শোষণ তুলনামূলক ভাবে বেশি জোরালো হলে একটি তুলনামূলক স্কেলে শীর্ষের উচ্চতাকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ সংখ্যা ৩ ধরা হলো। CH_2 গ্রুপের দুটি হাইড্রোজেনের পরিবেশ অন্যগুলোর থেকে আলাদা কিন্তু নিজেদের উভয়ের ক্ষেত্রে একই, তাই এদের একটিই ভিন্ন শীর্ষ, তুলনামূলক উচ্চতা ২। আর OH গ্রুপের হাইড্রোজেনের জন্য আরো কম ফ্রিকোয়েন্সিতে একটি শীর্ষ, তুলনামূলক উচ্চতা ১।

এলকোহলের এই উদাহরণের সঙ্গে আমরা পানির তুলনা করতে পারি। পানির H_2O তে যে দুটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস আছে তাদের উভয়ের পরিবেশ একেবারে একই তাই পানির জন্য একটিই শীর্ষ পাওয়া যায় যার তুলনামূলক উচ্চতা ২।

একই রাসয়নিক ফরমুলা বিশিষ্ট হয়েও যদি একাধিক রকমের অণুগঠন হয় তবে তা এন এম আর এ ধরা পড়ে। ডাইক্লোরো বেনজিনের ফরমুলা হলো $C_6H_4Cl_2$। বেনজিনের (C_6 H_6) ৬ টি কার্বনের যে ষড়ভূজ রিং তার প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি করে হাইড্রোজেন যুক্ত থাকে। এদের দুটিকে ক্লোরিন পরমাণু দিয়ে প্রতিস্থাপন করেই তৈরি হয় ডাইক্লোরোবেনজিন। কিন্তু ৬টি হাইড্রোজেনের মধ্যে কোন দুটিকে? রিং এর ১ ও ২ নম্বর স্থানে এটি ঘটলে আমরা তাকে ডাইক্লোরোবেনজিন-১,২ বলি। ১ ও ৩ নম্বরে ঘটলে তাকে ডাইক্লোরোবেনজিন-১,৩ এবং ১ ও ৪ নম্বর স্থানে ঘটলে বলি ড্রাইক্লোরোবেনজিন-১,৪। এরা কিন্তু একটির থেকে অন্যটি ভিন্ন অণু।

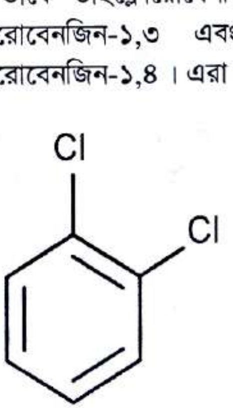

ডাইক্লোরোবেনজিন ১,২
ষড়ভূজ বেনজিন রিং এর প্রত্যেক কোণায় থাকা C (কার্বন) ও তার সঙ্গে Cl (ক্লোরিন) বিহীন গুলোতে থাকা H (হাইড্রোজেন) দেখানো হয়নি।

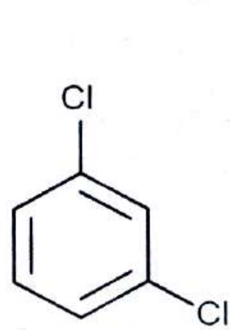

ডাইক্লোরোবেনজিন ১,৩

ডাইক্লোরোবেনজিন ১,৪

কোন নমুনায় এগুলোর মধ্যে কোনটি রয়েছে তা ধরা পড়ে এন এম আর এ। কারণ যে গঠনের প্রতিসাম্য বেশি সেখানকার কার্বন-১৩ সৃষ্ট এন এম আর শীর্ষের সংখ্যা কম হবে যেহেতু পরিবেশের বিভিন্নতা সেক্ষেত্রে কম। ১,৪ গঠনে প্রতিসাম্য সব চেয়ে বেশি এবং এতে প্রতিসাম্য অনুযায়ী শুধু দুটি অসম বিকল্প পরিবেশ রয়েছে বলে মাত্র দুটি শীর্ষ পাওয়া যায়। এই দুটি বিকল্পের একটিতে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা বেশি, অন্যটিতে কম– যেটিতে বেশি তার শীর্ষ উচ্চতাও বেশি, অন্যটির কম। একই কারণে ১,২ গঠনে প্রতিসাম্য কিছু কম ও পরিবেশ বিকল্প তাই তিন রকমের বলে এতে তিনটি শীর্ষ, প্রত্যেক বিকল্পে নিউক্লিয়াস সংখ্যা সমান তাই শীর্ষ উচ্চতাগুলো সমান। ১,৩ গঠনে প্রতিসাম্য আরো কম, বিকল্প চার রকম– এর মধ্যে দুটিতে নিউক্লিয়াস সংখ্যা কম বলে দুটি বেঁটে শীর্ষ, আর দুটিতে উচ্চ শীর্ষ। এন এম আর ছবিতে শীর্ষগুলোর সংখ্যা ও উচ্চতা দেখে আমরা বুঝতে পারি আমাদের হাতে কোন গঠনের অণু রয়েছে।

আমরা উদাহরণগুলো সরলতর অণুর ক্ষেত্রে নিলাম। জটিলতর ও বৃহত্তর অণুর ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা এন এম আর এর ফলাফল ব্যাখ্যায় দেখা দেয়। যেমন একই অণুতে যদি একই পরমাণু গ্রুপ (যেমন CH_3 গ্রুপ) বেশ ক'টি থাকে এবং তাদের বিভিন্নটির পরিবেশ বিভিন্ন হয় তাহলে শুধু এই গ্রুপের জন্যই বেশ ক'টি শীর্ষ থাকবে কোনটি কোন নিউক্লিয়াসের বুঝা তখন খুব দুরূহ হবে। আর তাছাড়া বড় অণুতে শীর্ষগুলো এত কাছাকাছি চলে আসবে যে একটির উপর আরেকটি গিয়ে পড়তে পারে এবং এদেরকে পৃথক করা কঠিন হয়ে উঠে। এন এম আর পদ্ধতির সাম্প্রতিক অনেক উন্নয়নের ফলে এসব সমস্যার এখন সমাধান হয়েছে। অতি বড় ও জটিল প্রোটিন অণু সহ নানা অণুর ক্ষেত্রে এন এম আর পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে।

গবেষণার বাইরে এন এম আর এর ব্যাপক ব্যবহার চলছে রোগ নির্ণয়ে এম আর আই (ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং) হিসেবে। এখানে বাইরে থেকেই শরীরের ত্রিমাত্রিক জরীপ করা সম্ভব হয়– ব্যতিক্রমি কোন কিছু আছে কিনা, থাকলে ঠিক কোন জায়গায় আছে তা নির্ণয়ে। এটি সম্ভব হয় এন এম আর এর

শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রটি সর্বত্র সমান না রেখে শরীরের এক দিক থেকে শরীরের ভেতরটা ভেদ করে অন্যদিক পর্যন্ত ক্ষেত্রটি ক্রমাগত বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে শরীরের পুরুত্বের দিকের প্রত্যেক বিন্দুতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে। যেহেতু রিজোনেন্স চৌম্বক ক্ষেত্রের উপরও নির্ভর করে তাই ভেতরের যত গভীরের বিন্দুতে অণুর বিষয় আসবে তার শীর্ষ ভিন্ন জায়গায় হবে। একই সমতলে থাকা অণুগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্য একই চৌম্বক ক্ষেত্রের হিসেবে তা যথারীতি আগের মতই হবে। এন এম আর ফলাফলগুলো কম্পিউটারে ত্রিমাত্রিক ইমেজিং এর আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয় এ ভাবে। পুরো এন এম আর ইমেজিং এ বলা যাবে কোন অংশ শরীরের ভেতর কোন জায়গার। এদের মধ্যে পরিবেশের পার্থক্যও নির্ণয় করা যাবে। যেমন শুধু পানির অণুর এন এম আর এর ইমেজ নিলে এতে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের রিল্যাক্সেশন টাইম শরীরের সাধারণ কোষে যত হবে টিউমার কোষের পানির ক্ষেত্রে তা কিছু বেশি হবে। এর সুযোগ নিয়ে টিউমারের উপস্থিতি এবং তার অবস্থান সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় সম্ভব ভিন্ন রিল্যাক্সেশন টাইমের অঞ্চলটি দেখে। আমরা দেখেছি রিল্যাক্সেশন টাইম নির্ভর করে নিউক্লিয়াসের পরিবেশের উপর; সাধারণ কোষে ও টিউমার কোষে এই পরিবেশ একই নয়।

কঠিন পদার্থ

কঠিন পদার্থের গঠন

একই বস্তু নানা পরিস্থিতিতে গ্যাস, তরল বা কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে। জলীয় বাষ্প জমে পানিতে, এবং পানি জমে বরফে পরিণত হবার মধ্যে আমরা এর একটি অতি সাধারণ উদাহরণ দেখতে পাই। গ্যাস অবস্থায় পদার্থের কণাগুলো দূরে দূরে থাকে– সেই কণা পরমাণু হতে পারে, অণুও হতে পারে। এদের পরস্পরের মাঝখানে তেমন কোন বন্ধন থাকে না বলে স্বাধীন ভাবেই এগুলো নাচানাচি করে, পরস্পর সংঘর্ষ করে, ধাক্কা খেয়ে অন্য দিকে চলে যায়। তরল অবস্থায় কণাগুলো অতটা দূরে থাকেনা, বরং পরস্পরের কাছাকাছিই থাকে। কিন্তু এগুলো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে বেশ চলাচল করতে পারে, পরস্পরের গা ঘষে দিয়ে এদিক ওদিক চলে যেতে পারে। এগুলোর পরস্পরের মধ্যে বেশ কিছু বন্ধন বলও কাজ করে। কঠিন অবস্থায় কণাগুলো পরস্পরের একেবারে লাগোয়া হয়ে আটসাট প্যাক করা অবস্থায় থাকে প্রত্যেকটির স্থায়ী সুনির্দিষ্ট জায়গায়। এগুলোর পরস্পরের মধ্যে বন্ধন বল যথেষ্ট জোরালো। ঐ একই জায়গায় থেকেও এরা অবশ্য কম্পনের মত কিছু নড়াচড়া করতে পারে। তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের কণাগুলোর ঐ কম্পন ক্রমাগত বাড়ে, তারপর এক পর্যায়ে ঐ আঁটসাট প্যাক করা ব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে এটি তরলে পরিণত হয়। এ ঘটনাটিকে আমরা গলন বলি। এটি ঘটে এক এক পদার্থের জন্য খুবই সুনির্দিষ্ট একটি উত্তাপে – যা হলো গলনাঙ্ক। আরো তাপ দিলে কণাগুলো আরো স্বাধীন হয়ে এক সময় গ্যাসে পরিণত হয়। এই ঘটনাটিও ঘটে একটি সুনির্দিষ্ট উত্তাপে যাকে বলা হয় স্ফুটনাঙ্ক।

কঠিন পদার্থে কণাগুলোর পরস্পর বন্ধন বলটি বিভিন্ন রকমের হতে পারে– যার প্রধানগুলোকে আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। এটি সাধারণ লবনের বন্ধন বলের মত আয়নিক বল হতে পারে যেখানে সোডিয়াম ও ক্লোরিন পরমাণু পর পর থাকে– প্রথমটি ধনাত্মক আয়ন হিসেবে ও দ্বিতীয়টি ঋণাত্মক আয়ন হিসেবে। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যুতিক আকর্ষণই এই সোডিয়াম ক্লোরাইডকে কঠিন পদার্থ হিসেবে একত্র রাখে। কিন্তু দু'রকমের কণাই পরমাণু পর্যায়েই থাকে, কয়েকটি মিলে অণু গঠন করেনা। অনেক কঠিন পদার্থেরই গঠন কণিকা এরকম পরমাণু হিসেবেই থেকে যায়। তবে কোন কোন বস্তুর পরমাণুগুলো কঠিন পদার্থের

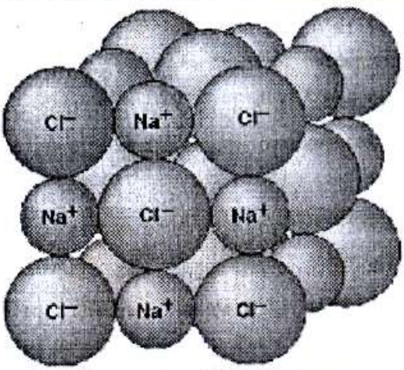

কঠিন অবস্থায় সোডিয়াম ক্লোরাইড
(সাধারণ লবন)

মধ্যেও কয়েকটি মিলে আলাদা অণু গঠন করে, সেই অণুগুলোই প্যাক করা অবস্থায় থাকতে পারে। এগুলোর অধিকাংশ কো-ভ্যালেন্ট অণু গঠন করে– বাইরের অরবিটালের ইলেকট্রন শেয়ার করে কীভাবে এরকম জোরালো কো-ভ্যালেন্ট আণবিক বন্ধন তৈরি হয় তা আমরা আগেই দেখেছি। একই পরমাণুতে তৈরি এরকম একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

আয়োডিন সাধারণ অবস্থায় কঠিন অবস্থায় থাকে। দুটি আয়োডিন পরমাণু জোরালো কো-ভ্যলেন্ট বন্ধনে আয়োডিন অণু গঠন করে। এই অণুগুলো আবার কঠিন অবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে গাদাগাদি করে প্যাক হয়ে থাকে – অণুগুলোর পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বল কিন্তু বেশ দুর্বল। এরকম কঠিন পদার্থকে মলেক্যুলার সলিড বা আণবিক কঠিন পদার্থ বলা হয়। অণুগুলোর মধ্যে দুর্বল বন্ধনের কারণে, অণুর ভেতরকার জোরালো কোভ্যালেন্ট বন্ধন সত্ত্বেও এই কঠিন পদার্থ কম উত্তাপেই গলে তরল হয়ে যেতে পারে– অণুগুলো তখন আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু অণুর ভেতরের পরমাণুগুলো আলাদা হয়না। অন্যদিকে সোডিয়াম ক্লোরাইডের মত আয়নিক কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক অনেক বেশি, আর গলার পর এটি সোডিয়াম ও ক্লোরিন আয়ন হিসেবেই আলাদা হয় সোডিয়াম ও ক্লোরিন অণু হিসেবে নয়।

অধিকাংশ কঠিন পদার্থ কিন্তু ধাতব প্রকৃতির আয়োডিনের মত অধাতব নয়। ধাতুও কিন্তু পরমাণু হিসেবেই কঠিন পদার্থে থাকে, অণু গঠন করেনা। ধাতুর পরমাণুগুলো অন্য একটি বিশেষ ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে যাকে বলা হয় ধাতব বন্ধন। ধাতুর পরমাণুগুলো যখন কঠিন পদার্থে আটসাট প্যাক করা থাকে তখন তাদের নিউক্লিয়াস থেকে সবচেয়ে দূরে বাইরের ইলেকট্রনগুলো কিন্তু আর বিশেষ কোন পরমাণুর আওতায় থাকেনা বরং ওখানকার সব পরমাণুর সাধারণ আওতায় থাকে, এবং অবাধে ঐ কঠিন পদার্থের পুরোটার মধ্যে বিচরণ করতে পারে। বলা যায় ধাতব কঠিন পদার্থে স্থির রয়েছে তার আয়নগুলো যারা কিনা ঐ বাইরের ইলেকট্রনগুলো বাদ যাবার পর বাকি ইলেকট্রনগুলো নিয়ে থাকা

নিউক্লিয়াসগুলো (সার্বিকভাবে ধনাত্মক)। এরা যেন ডুবে আছে বাইরের বিচরণশীল সেই ইলেকট্রনগুলোর সমুদ্রে। ধনাত্মক ঐ আয়নগুলো এবং ঋণাত্মক ইলেকট্রন সমুদ্রের মধ্যে যে আকর্ষণ তাই ধাতব কঠিন পদার্থটির বন্ধন বল হিসেবে কাজ করে। ঐ বিচরণশীল ইলেকট্রন সমুদ্রই কিন্তু ধাতুকে তার অনেকগুলো গুণ দিয়ে থাকে। যেমন প্রধানত এদের কারণেই ধাতু ভাল তাপ পরিবাহী এবং ভাল বিদ্যুৎ পরিবাহী।

আমরা যদি কঠিন পদার্থের ক্ষুদ্র একটি অংশে স্থানীয় ভাবে অণু-পরমাণুর পর্যায়ে বিবেচনা করি সেখানে বন্ধন-বল অনুযায়ী একটি স্থানীয় শৃঙ্খলা দেখতে পাই। কী ভাবে এর কণাগুলো সেখানে সুসমঞ্জস ভাবে প্যাক হবে এটি তার শৃঙ্খলা। এটি প্রধানত নির্ভর করে বন্ধন বলের ক্ষেত্রে বলের কোন সুনির্দিষ্ট দিক থাকে কিনা তার উপর। কোভ্যালেন্ট বন্ধনের ক্ষেত্রে এরকম দিকের ব্যাপারটি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এর কারণ পরমাণুর ইলেকট্রন মেঘের বহিস্থ অরবিটালটি দিক-নির্বিশেষ, অর্থাৎ সর্বদিকে সমান ভাবে প্রযোজ্য একটি গোলকাকার প্রতিসাম্যে থাকতে পারে। এমনটি S অরবিটালের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সিরিজের আগের বইয়ে অরবিটালগুলোর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আবার P অরবিটালের ক্ষেত্রে অরবিটালগুলো একদিকে লম্বাটে হয়ে থাকে; একটি অরবিটাল অন্যটির সঙ্গে সমকোণে থাকে।

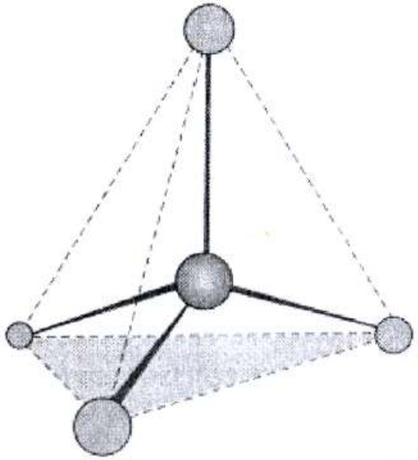

মিথেনের অণুতে পরমাণুর বন্ধনের ত্রিমাত্রিক গঠন একটি টেট্রাহেড্রন তৈরি করে। বন্ধনগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি কোণ ১০৯.৫°। মাঝখানে কার্বন পরমাণু আর টেট্রাহেড্রনের চার কৌণিক বিন্দুতে চারটি হাইড্রোজেন।

দুই পরমাণুর P অরবিটালগুলো যখন পরস্পরের উপরিপাতিত হয়ে ইলেকট্রন শেয়ার করে তখন বিভিন্ন বন্ধনগুলোর মধ্যেও ঐ রকম সমকোণের কাছাকাছি কোণ থাকার প্রবণতা দেখা দেয়। এভাবেই বন্ধনের দিকনির্ভরতা সৃষ্টি হয়। S ও P অরবিটাল উভয়েই বন্ধনে মিশ্রিতভাবে অংশ নিয়ে অবশ্য এই কোণের ব্যতিক্রমও ঘটায়। যেমন কার্বনের ক্ষেত্রে কার্বন পরমাণুকে যদি পিরামিড সদৃশ টেট্রাহেড্রন ত্রিমাত্রিক গঠনের মাঝখানে আছে বলে ধরে নিই তাহলে তার

বন্ধনগুলোর দিক হবে টেট্রাহেড্রনের চারটি কোণার বিন্দুর দিকে যাদের মধ্যে পরস্পর কোণ ১০৯.৫° যা প্রত্যাশিত সমকোণের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশি। কোভ্যালেন্ট বন্ধনের কঠিন পদার্থগুলোর এই দিক-নির্ভরতার কারণে এগুলোকে বন্ধন কোণগুলো ঠিক রেখেই প্যাক হতে হয়, সেজন্য তার আকৃতির উপর এর প্রভাব পড়ে। আকৃতি ঠিক রাখতে গিয়ে সব চেয়ে বেশি আটসাট প্যাকিং এর হতে পারেনা। আয়নিক ও ধাতব বন্ধনগুলোর মধ্যে কোন দিকনির্ভরতা থাকেনা– তাই এসব কঠিন পদার্থে পরমাণুগুলো খুব আটসাট হয়ে প্যাক হতে পারে। এরকম আটসাট প্যাকিং বিভিন্ন সুশৃঙ্খল রূপ নিতে পারে যা নির্ভর করবে পদার্থটির উপর।

দূর পাল্লার শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা

অধিকাংশ কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে স্থানীয় শৃঙ্খলা ছাড়াও একটি দূরপাল্লার শৃঙ্খলা থাকে যাতে পরমাণু বা অণুগুলো সুনির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর শৃঙ্খলার সঙ্গে সজ্জিত থাকে – এরকম কঠিন পদার্থকে আমরা ক্রীষ্টাল বা স্ফটিক বলি। এক খন্ড কঠিন পদার্থের পুরোটাই যদি একই শৃঙ্খলায় নিরবিচ্ছিন্ন থাকে তা হলে সেটিকে সিঙ্গেল ক্রীষ্টাল বলা হয়। বেশির ভাগ কঠিন পদার্থে অবশ্য ছোট ছোট ক্রীষ্টাল একত্রে থাকে– সব মিলে টুকরাটিকে পলিক্রীষ্টাল বলা হয়। ধাতুর ক্ষেত্রে এরকম ছোট ক্রীষ্টালগুলোকে আমরা অনেক সময় ধাতুর গায়ের উপর ছোট ছোট দানার মত দেখতেই পাই। ক্রীষ্টালের শৃঙ্খলার গঠনটি কী ভাবে এক্সরে ক্রীষ্টালোগ্রাফির সাহায্যে উদ্ঘাটন করা যায় সেটি আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি।

সব কঠিন পদার্থ অবশ্য ক্রীষ্টাল হিসেবে থাকেনা। যেগুলোর অণু বা পরমাণুর মধ্যে দূর পাল্লার শৃঙ্খলা থাকেনা– সেগুলো অনেকটা এলোমেলো ইতস্তত ভাবে থাকে। তাদের বলা হয় এমরফাস যার অর্থ আকৃতি-বিহীন। তাদেরকে কাচীয়ও বলা যায় কারণ পরিচিত জিনিসের মধ্যে কাচ এর একটি ভাল উদাহরণ। কাচের ক্ষেত্রে যেমন হয় তাদের সবার ক্ষেত্রে উত্তপ্ত করে তরল অবস্থায় নিলেও কণাগুলো বা কণা-সমষ্টিগুলো খুব বেশি নড়াচড়া করতে পারেনা– তরলটি চটচটে অবস্থায় থাকে। আবার ঠান্ডা করে যখন একে কঠিন করা হয় তখনো এগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জা নিতে পারেনা – কঠিন হয়েও এলোমেলো থাকে। এ যেন কঠিন হয়েও তরল থাকা– শুধু চটচটে ভাবটি এখন এত বেড়ে গেছে যে সাধারণ তরলের মতো সহজে প্রবাহিত হতে পারেনা। এরকম কঠিন পদার্থের খুব সুনির্দিষ্ট গলনাঙ্ক থাকেনা। উত্তাপ একটি পর্যায়ে পৌছলে কিছুটা চটচটে ভাব বজায় রেখেও প্রবাহিত হবার ক্ষমতা বাড়তে বাড়তে এটি ধীরে ধীরে তরল রূপ

নিতে থাকে। সুশৃঙ্খল সজ্জার অভাবেই একে সহজে বাঁকানো যায় না, ভেঙ্গে যায়– অথচ বাঁকানো যায় ধাতব পদার্থকে।

কঠিন পদার্থের নানা গুণাগুণ কীসের উপর নির্ভর করে? অন্য সব অবস্থার মত এক্ষেত্রেও যে অণু বা পরমাণু দিয়ে এটি গঠিত তার রাসায়নিক গুণাগুণের উপর এটির গুণাগুণ নির্ভর করবে; আর এমন হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এর ক্রীষ্টালের আকৃতির উপরও এটি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। ক্রীষ্টাল হওয়া না হওয়ার উপর যে নির্ভর করে সেটি তো দেখলাম। আর একটি উদাহরণ দিলে ক্রীষ্টালের প্রকৃতির প্রভাবটি ভাল বুঝা যাবে। মূল্যবান পাথর হীরা এবং পেন্সিলের শীষে ব্যবহৃত গ্রাফাইট উভয়েই শুধু কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরি। এদিক থেকে উভয়ের রাসায়নিক পরিচয় কয়লার সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু কার্বন হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের গুণাগুণে রয়েছে আকাশ পাতাল তফাৎ– শুধুমাত্র তাদের ক্রীষ্টাল আকৃতির পার্থক্যের কারণে। হীরার মধ্যে কার্বন পরমাণুগুলো একটি বিশেষ ক্রীষ্টাল আকৃতিতে থাকে যাতে এক একটি পরমাণু অন্য চারটির সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে শক্ত ভাবে পরস্পরের সঙ্গে আটকানো একটি জটিল ত্রিমাত্রিক রূপ নেয়। এই কারণে হীরা অত্যন্ত শক্ত– দুনিয়ার সব চেয়ে শক্ত বস্তু। সবদিক থেকে খুব সুশৃঙ্খল আকৃতিতে থাকায় এটি খুব শক্ত জিনিস কাটা ছেরা করতে ব্যবহৃত হয় যেমন তেলের কূপ খনন করতে; অন্য দিকে অলঙ্কার হিসেবেও খুবই মূল্যবান। গ্রাফাইটে কার্বন পরমাণুগুলো চেপ্টা সমতল দ্বিমাত্রিক অনেকগুলো স্তরে বিভক্ত থাকে। ফলে এতে অল্প শক্তি প্রয়োগ করলে যেমন ঘষা দিলে স্তরগুলো পরতে পরতে খসে আসে অতি সহজেই। এটি পিচ্ছিলতার সৃষ্টি করে– এ জন্য একে নরম পিচ্ছিলকারক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, পেন্সিলের শীষ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়– হীরার একেবারে বিপরীত গুণ।

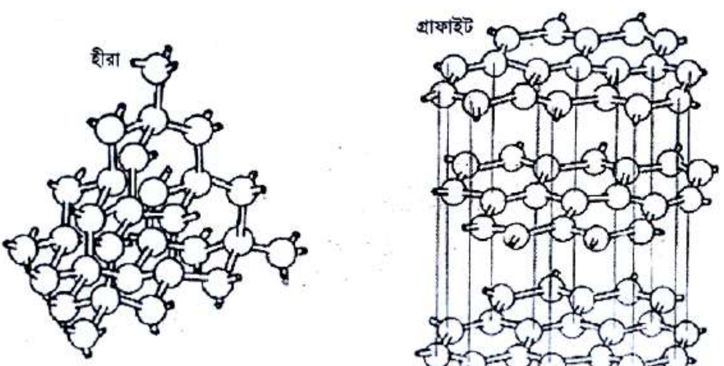

হীরা ও গ্রাফাইটে কার্বন পরমাণুর ভিন্নতর ক্রীষ্টাল গঠন

শক্ত জিনিস শক্ত কেন ?

ক্রীষ্টালকে তখনই নিঁখুত বলা যাবে যখন তার নিজস্ব অণু-পরমাণু এতে একেবারে নিঁখুত ভাবে সুনির্দিষ্টভাবে পর পর পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে – কোন রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এরকম নিঁখুত ক্রীষ্টাল পাওয়া যায়না, তাত্ত্বিক ভাবেও দেখানো যায় যে এরকম নিখুত ক্রীষ্টাল সম্ভবও নয়। প্রকৃত ক্রীষ্টালে সব সময় কিছু না কিছু ত্রুটি থাকে। মজার ব্যাপার হলো এই ত্রুটিগুলোই কঠিন পদার্থকে অনেক চমৎকার গুণ দিয়ে থাকে যা নিঁখুত ক্রীষ্টালে সম্ভব হতোনা।

এই ত্রুটিগুলো বিভিন্ন রকমের হতে পারে– ক্রীষ্টালের যে বিশেষ বিন্দুটিতে ঐ পদার্থের অণু বা পরমাণুটি থাকার কথা সে রকম একটি জায়গা যদি খালি থাকে তা হলে সেটি একটি ত্রুটি– যাকে বলা হয় ভ্যাকেন্সি বা শূন্য জায়গা। আবার অণু-পরমাণুগুলোর কোনটি সঠিক জায়গায় না থেকে অন্য অণু-পরমাণুগুলোর ফাঁকে ঢুকে থাকতে পারে– একে বলা যায় ফাঁকের কণা। এই ফাঁকের কণা ঐ কঠিন পদার্থেরই একটি অণু-পরমাণু হতে পারে যা সঠিক জায়গা থেকে সরে ফাঁকে চলে এসেছে– ফলে একটি ভ্যাকেন্সি আর একটি ফাঁকের কণা এক সঙ্গে সৃষ্টি করেছে। আবার এটি বিজাতীয় কোন অণু-পরমাণুও হতে পারে, অন্য কোন পদার্থের অণু-পরমাণু এতে ঢুকে পড়েছে। বিজাতীয় অণু-পরমাণু অবশ্য ফাঁকে না ঢুকে বরং ক্রীষ্টালের স্বাভাবিক কণার জায়গাতেও বসতে পারে – সেক্ষেত্রে সেটি হবে বদলি কণা। ভ্যাকেন্সি এবং এরকম সব রকমের ফাঁকের কণাকে, অথবা বিজাতীয় বদলি কণাকে, সাধারণ ভাবে বিন্দু ত্রুটি বলা যায় কারণ এ ত্রুটিগুলো বিন্দুর মত জায়গায় ঘটছে।

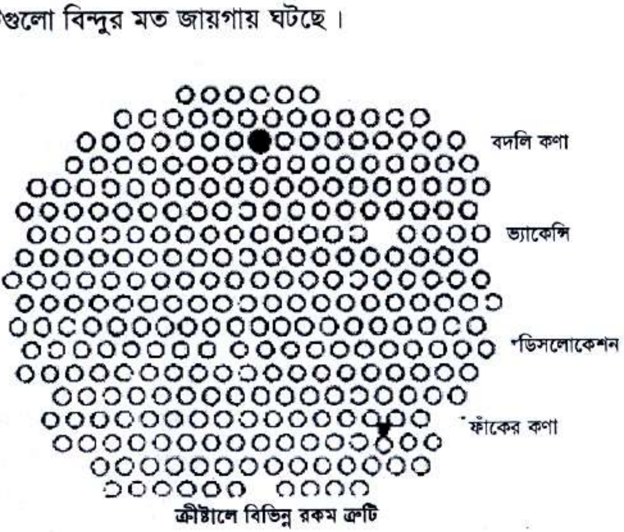

ক্রীষ্টালে বিভিন্ন রকম ত্রুটি

কোন কোন ক্রুটি কিন্তু বিন্দুতে সীমাবদ্ধ নয়, এতে অণু-পরমাণুর একটি পুরো সারিই আর ঠিক থাকে না। সাধারণত ধাতব কঠিন পদার্থে ব্যাপারটি দেখা যায়। ধাতুর টুকরাকে বিকৃত করার মত বল প্রয়োগ করা হলে এর এক স্তর পরমাণু সংলগ্ন আর এক স্তরের উপর দিয়ে স্লিপ করে বা গড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়– এতে এমন অবস্থা হতে পারে যে যেন একটি বাড়তি আধা-স্তর দুটি স্তরের মাঝখানে ঢুকে পড়েছে। ঠিক যেখানে এই আধা স্তরটি শেষ হচ্ছে সেখানে পরমাণুর সারিগুলো বিকৃত হয়ে মনে হবে যেন একটি পুরো সারিই বাদ পড়ে গেছে। এই রকম একটি রেখার আকারের ক্রুটিকে বলা হয় ডিসলোকেশন বা সরে যাওয়ার জায়গা। যতক্ষণ পর্যন্ত ধাতুর টুকরার উপর বিকৃত করার– যেমন বাঁকানোর বা মোচড়ানোর মত – বল বজায় থাকবে এই ডিসলোকেশন রেখাটি একটু একটু করে সরতে থাকবে এবং বস্তুটিকে পুরো অতিক্রম করে পুরো সরে গেলে টুকরাটির কিছুটা বিকৃতি স্থায়ী ভাবে সম্পন্ন হবে। ধাতুর মধ্যে বিন্দু ক্রুটি যেমন সব সময় কিছু না কিছু থাকে তেমনি এরকম রেখা ক্রুটি ডিসলোকেশনও সব সময় কিছু না কিছু থাকে। আর ধাতু নমনীয় বা বাঁকানোর উপযুক্ত করতে এগুলো একটি বড় ভূমিকা নেয়। উত্তাপ, পীড়ন ইত্যাদি অবস্থায় এরকম নূতন নূতন ডিসলোকেশন সৃষ্টিও হতে থাকে। ধাতু যদি শক্ত না হয় বা দৃঢ় না হয় তা হলে তা দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করা যায়না, শক্ত বীম, শেকল কিংবা সেতু তৈরি করা যায়না। বাঁকানো, মোচড়ানো, টানা ইত্যাদির মাধ্যমে ধাতুর উপর বলপ্রয়োগ করলে তার এক স্তর আর এক স্তরের উপর দিয়ে গড়িয়ে সহজেই এটি বিকৃত হতে পারে। সেটি যাতে না হয় সেজন্য কয়েক রকমের ব্যবস্থা নেয়া যায়। একটি ব্যবস্থা হলো পলি-ক্রীষ্টাল ধাতুর মধ্যে যে ছোট ছোট ক্রীষ্টাল থাকে সেগুলাকে যথাসম্ভব ছোট করা। গলিত ধাতুকে ঠান্ডা করে যখন কঠিন করা হয় তখন দ্রুত তা করে ধাতুর ক্রীষ্টালগুলোকে অপেক্ষাকৃত ছোট করা যায়। কঠিন হবার

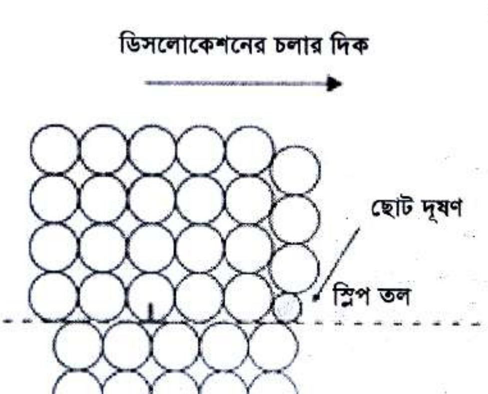

ডিসলোকেশন অগ্রসর হবার মাধ্যমে স্লিপ তলের উপরের অংশের স্লিপ করার মাধ্যমে কঠিনের বিকৃতি। ছোট দূষণ অণু অগ্রসর হওয়াটি থামিয়ে দিতে পারে।

জন্য ক্রীষ্টালের পুরো সজ্জার মধ্যে সঠিক জায়গায় বসে পড়ার জন্য অণুগুলো বেশি সময় পায়না বলেই ক্রীষ্টাল ছোট হয়। পীড়নের মুখে একটি ডিসলোকেশন ধাতুর মধ্যে এগিয়ে গিয়ে প্রান্তে চলে গেলে ধাতু খানিকটা বেঁকে যাওয়া ব্যবস্থা হয়। এভাবে অনেকগুলো ডিসলোকেশন তা করলে এটি যথেষ্ট বাঁকে। কিন্তু ছোট ক্রীষ্টালগুলোর বা দানাগুলোর মধ্যে যে সীমারেখা তার মধ্যে গিয়ে পড়লে ডিসলোকেশন সহজে আর এগুতে পারেনা। যত ছোট দানা হবে ডিসলোকেশন তত ঘন ঘন বাধা পেয়ে তার চলাচল তত ব্যাহত হবে, ধাতুটিও তত দৃঢ় হবে।

ধাতুকে বিশুদ্ধ না রেখে তার মধ্যে যদি কিছু বিজাতীয় অণু ঢুকানো হয় সেগুলোও ডিসলোকেশনের চলাচলে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কারণ ঐ পদার্থের সাধারণ পরমাণুর তুলনায় এই বিজাতীয় পরমাণুগুলো বেসাইজের বলে ডিসলোকেশনের সামনে পড়ে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। লোহায় এভাবে সঠিক মাত্রায় কার্বন ঢুকিয়ে তা দিয়ে ইস্পাত তৈরি হলে তা অনেক বেশি শক্ত ও দৃঢ় হয়। এলুমিনিয়াম হালকা হওয়ার কারণে অনেক কাজে এর ব্যবহার কাম্য হয়, কিন্তু এটি নরম হবার কারণে এসব কাজের উপযুক্ত নাও হতে পারে। অথচ মাত্র ১.২৫% ম্যাঙ্গানিজ এর সঙ্গে মিশিয়ে যে সঙ্কর ধাতু তৈরি হয় তা অনেক বেশি শক্ত ও দৃঢ় হয়ে পড়ে। এলুমিনিয়ামের ভেতর এই অল্প ম্যাঙ্গানিজ বেসাইজে থাকে বলে ডিসলোকেশনের চলাচল দুরূহ হয়। ধাতু শক্ত করার আরো একটি উপায় হলো পিটিয়ে বা রোল করে শক্ত করা। এরকম পেটালে, রোল করলে, বা বার বার এদিক ওদিক বাঁকালে ধাতুর মধ্যে নূতন নূতন অনেক ডিসলোকেশন সৃষ্টি হয়, তাতে বরং এটি নরম হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু অনেক ডিসলোকেশন রেখা বিভিন্ন দিক থেকে আসলে তাদের মধ্যে জট পাকিয়ে যাওয়ার সুযোগ ঘটে, যা রাস্তায় গাড়ির জ্যাম লাগার মত চলাচলকে ব্যাহত করে। এভাবে ডিসলোকেশন জট ধাতুকে বিকৃত করা কঠিন করে তোলে। এ কারণে কামার লোহা পিটিয়ে শক্ত করতে পারে, রোল করা লোহাও সাধারণ লোহা থেকে শক্ত হয়। ধাতুকে উত্তপ্ত করে হঠাৎ পানিতে ফেলে ঠান্ডা করলেও বাড়তি ডিসলোকেশন সৃষ্টি করে সেগুলোকে জট-খাইয়ে দেয়া যায়। আবার অল্প কিছু বিজাতীয় পদার্থ ঢুকিয়ে বা ভ্যাকেন্সি বাড়িয়ে যে বাড়তি বিন্দু ত্রুটি সৃষ্টি হয় সেগুলোও ডিসলোকেশন চলাচলের পথে বাধা হতে পারে। রাস্তায় গাড়ি চলাচলের সময় সামনে একটি খাদ পড়লে অথবা একটা রিক্সা মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন জ্যাম লেগে যায় এও তেমনি। এই উপমায় খাদটিকে ভ্যাকেন্সির সঙ্গে ও রিকশাটিকে বিজাতীয় অণুর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

এই সব রকম পদ্ধতিই ধাতুকে শক্ত ও দৃঢ় করার কজে ব্যবহৃত হয়– তার সবের মূলে রয়েছে ডিসলোকেশনের চলাচলে বাধা দেয়া, আর সবেরই মূলে

রয়েছে ক্রীষ্টালের ত্রুটি। এখানে আমরা একটি কঠিন পদার্থকে যে ভাবে তার আকৃতি হারাতে দেখলাম তা হলো বাঁক নেয়া বা বিকৃত হবার মাধ্যমে– যাকে আমর প্লাষ্টিক পরিবর্তন বলতে পারি। স্থিতিস্থাপকতার সীমার চেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করলে এরকম স্থায়ী পরিবর্তন হতে পারে।

কিন্তু যে সব বস্তু ভঙ্গুর, এদের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার সীমার চেয়ে কম বলপ্রয়োগেই, বিকৃত হবার আগেই, বস্তুটি ভেঙ্গে যেতে পারে। এখানেও ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঐ কঠিন বস্তুর মধ্যে ক্ষুদ্র ফাটল থাকা। এরকমের ফাটল তরল থেকে জমে কঠিন হবার সময় অথবা বস্তুটিকে নানা রকম পীড়নের সময়ও সৃষ্টি হতে পারে। অনেক ভ্যাকেন্সি একত্র হয়েও এরকম একটি ফাটল সৃষ্টি হতে পারে। আবার পর পর অনেকগুলো ডিসলোকেশন যদি একটি বাধার কাছে গিয়ে জমে যেতে থাকে সেখানে যে স্থানীয় পীড়নের অবস্থা সৃষ্টি হয় তাতেও ক্ষুদ্র ফাটল সৃষ্টি হতে পারে। বল প্রয়োগ করা হলে এরকম ফাটলগুলো বর্ধিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বিস্তৃত হয়ে বস্তুটি ভেঙ্গেই যায়। বস্তুটির নিজের অবয়ব যদি খুব ছোট হয় তা হলে উপরের উল্লেখিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ফাটল সৃষ্টির সম্ভাবনা এখানে কম থাকে, তাই তাদের ভঙ্গুরতাও কমে যায়। কাচ খুব ভঙ্গুর জিনিস। কিন্তু খুবই সরু চুলের মত কাচ তন্তু (গ্লাস ফাইবার) যদি তৈরি করা হয় তাতে ক্ষুদ্র ফাটলের সংখ্যা এত কম থাকে যে সাধারণ কাচের তুলনায় তার ভঙ্গুরতা একশত ভাগের এক ভাগে নেমে আসে। এজন্যই ফাইবার গ্লাসে গড়া আসবাব এত টেকসই হয়।

ক্ষুদ্র ত্রুটির আরো সব বড় প্রভাব

বস্তুর শক্ত সমর্থ হবার পেছনে ক্ষুদ্র ত্রুটির বড় অবদানের বিষয়টি আমরা দেখলাম। কঠিন পদার্থের আরো অন্যান্য গুণের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়ও এরকম ত্রুটিগুলোকে দেখা যায়। যেমন আমরা এর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার বিষয়টি আনতে পারি। ধাতুর ক্ষেত্রে পরমাণুর একেবারে বাইরের অরবিটালে থাকা ইলেকট্রনগুলো স্বচ্ছন্দে পুরো বস্তুটিতেই চলাচল করতে পারে, আর চার্জের এই প্রবাহটিই বৈদ্যুতিক কারেন্ট। কিন্তু পরিবাহী বস্তু মাত্রেরই এই প্রবাহের প্রতি এক রকম বাধা বা রেজিষ্ট্যান্স রয়েছে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী কিন্তু ক্রীষ্টালের ত্রুটিগুলোর কারণে প্রবাহের ইলেকট্রনগুলো বিক্ষিপ্ত হওয়াটাই রেজিষ্ট্যান্সের কারণ। বস্তুকে যদি ওরকম ত্রুটি থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করা যায় তা হলে রেজিষ্ট্যান্স কমতে কমতে অতি স্বল্প হয়ে পড়ে। অবশ্য উত্তাপের ফলে পরমাণু বা অণুর কম্পনকেও এক রকম ত্রুটি হিসেবে বিবেচনা করা যায়, এবং সেই

কম্পনও পরিবাহী ইলেকট্রন বিক্ষিপ্ত হবার একটি কারণ। তাই রেজিষ্ট্যান্সকে প্রায় শূন্যের কোঠায় নামাতে হলে উত্তাপকেও প্রায় শূন্যের কোঠায় নামাতে হবে। উত্তাপ একেবারে শূন্য হতে পারেনা। রেজিষ্ট্যান্স অবশ্য শূন্য হতে পারে অন্য একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে যাকে বলা হয় অতিপরিবাহিতা বা সুপার কন্ডাকটিভিটি। সে কথায় কিছু পরে আসছি।

সেমিকন্ডাক্টর নামে পারিচিত বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার ব্যাপারটি বেশ কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। সিলিকন, জারমেনিয়াম ইত্যাদি সেমিকন্ডাক্টরগুলো আজকের ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। বিশুদ্ধ অবস্থায় এগুলো উত্তাপের উপর নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিবাহিতার অধিকারী হয়। ধাতুর ক্ষেত্রে যে রকম পরিবহন করার জন্য যথেষ্ট ইলেকট্রন মজুদ থাকে এখানে কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। ইলেকট্রনের ব্যান্ড থিওরি নামে তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তুর নানা পরমাণুতে ইলেকট্রনের বিভিন্ন শক্তি অবস্থাগুলো পরস্পরের এত কাছাকাছি থাকে যে সব একাকার হয়ে শক্তি রেখার (লেভেল) বদলে শক্তি ফিতার (ব্যান্ড) সৃষ্টি হয়। নিম্ন শক্তি অবস্থার ব্যান্ড পুরোটাই ইলেকট্রনে ভর্তি থাকে যাকে বলা হয় ভ্যালেন্স ব্যান্ড। আর উপরের ব্যান্ড যাকে কন্ডাকশন ব্যান্ড বলা হয় সেটি প্রায় খালি থাকে। ধাতুর ক্ষেত্রে উভয় ব্যান্ড পরস্পর সংলগ্ন থাকে বলে ভোল্টেজ দিলে ইলেকট্রন অনায়াসে উপরের কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যায়। সেখানে শক্তি-অবস্থাগুলো খালি থাকে বলে তাতে ইলেকট্রন বিচরণ করে কারেন্ট সৃষ্টি করতে পারি।

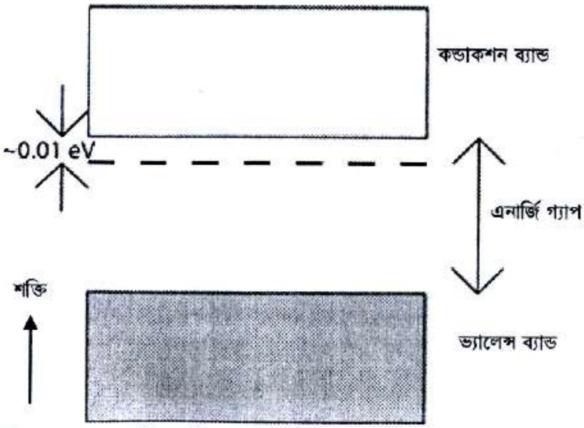

সেমিকন্ডাক্টরের ব্যান্ড ডায়াগ্রাম

অপরিবাহী পদার্থে এবং সেমিকন্ডাক্টরে কিন্তু নিচের ভ্যালেন্স ব্যান্ড ও উপরের কন্ডাকশন ব্যান্ডের মাঝে একটি ব্যবধান থাকে যাকে বলা হয় ব্যান্ড গ্যাপ। এই

গ্যাপের মধ্যে কোন ইলেকট্রন থাকা অবৈধ কারণ এখানে কোন শক্তি- অবস্থা নেই। ব্যাণ্ড গ্যাপ অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত হওয়াতে যথাযথ উত্তাপ পেলে অবশ্য ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে এক একটি ইলেকট্রন প্রয়োজনীয় শক্তি লাভের ফলে ঐ গ্যাপ পার হয়ে কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে আসতে পারে। সে প্রক্রিয়ায় ওভাবে চলে আসা প্রত্যেকটি ইলেকট্রন পরিপূর্ণ ভ্যালেন্স ব্যান্ডে একটি ইলেকট্রন-শূন্যতা সৃষ্টি করে আসে – যাকে বলা হয় গর্ত বা হোল। এভাবে প্রত্যেকটি ইলেকট্রনের গ্যাপ পার হওয়ার প্রক্রিয়ায় একই সঙ্গে একটি পরিবাহী ইলেকট্রন ও একটি পরিবাহী হোল সৃষ্টি হয় (ঋণাত্মক চার্জের অভাব হবার সুবাদে হোলকে একটি ধনাত্মক চার্জের মত বিবেচনা করা যায় যা কারেন্টে অবদান রাখে ইলেকট্রনের উল্টো দিকে প্রবাহিত হয়ে)। প্রায় ইলেকট্রন শূন্য হওয়াতে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেরকম পরিবাহী ইলেকট্রনগুলো অবাধে বিচরণ করতে পারে তেমনি প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে ইলেকট্রনে ভর্তি ভ্যালেন্স ব্যান্ডে হোলগুলো অবাধে বিচরণ করতে পারে। এভাবে একটি ঋণাত্মক ইলেকট্রন ও একটি ধনাত্মক হোল পরিবাহী কণিকা এক যোগে তৈরি হলো যারা একযোগে কারেন্ট সৃষ্টি করতে পারে– ইলেক্ট্রনটি বর্তনীর ধনাত্মক প্রান্তের দিকে আর হোলটি ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয়ে। উত্তাপ বাড়লে এরকম পরিবাহী কণিকার জোড়া অধিকতর সৃষ্টি হয় বলে সেমিকন্ডাক্টরের পরিবাহিতা বাড়ে।

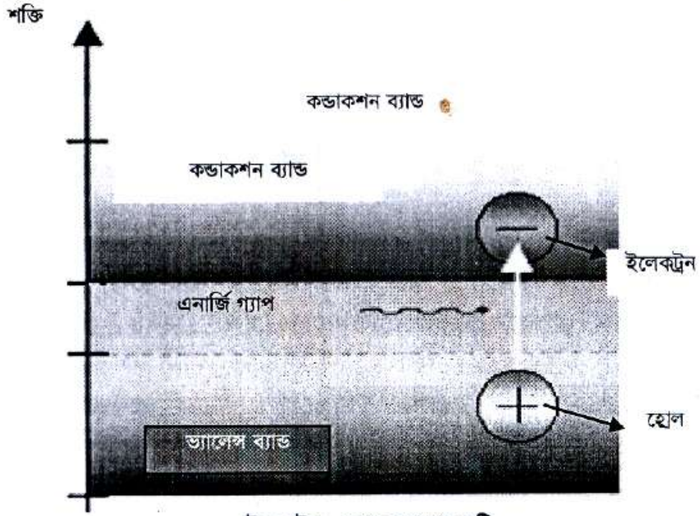

ইলেকট্রন - হোল জোড়ার সৃষ্টি

তো গেল বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকা সেমিকন্ডাক্টরের কথা। কিন্তু বিশেষ ধরনের কিছু বিজাতীয় পদার্থ খুব সামান্য পরিমাণে এতে মেশানো হলে কোন কোন বিজাতীয়

বস্তুর ক্ষেত্রে তা সেমিকন্ডাক্টরকে ইলেকট্রন দান করে বলে পরিবাহী ইলেকট্রনের সংখ্যা অনেক বাড়বে– ঐ বিজাতীয় বস্তুর পরিমাণ যত বেশি হবে ঐ বাড়তি পরিবাহী ইলেকট্রনও তত বেশি হবে। অন্য কিছু বিজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে বাড়তি হোল সৃষ্টির মাধ্যমে সেমিকন্ডাক্টর থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বলে। কাজেই প্রথমটি ঘটলে সেমিকন্ডাক্টরটিকে বলা হয় এন-টাইপ (নেগেটিভ টাইপ) এবং দ্বিতীয়টি ঘটলে তাকে বলে পি-টাইপ (পজিটিভ টাইপ)। ঐ বিজাতীয় বস্তু বা ত্রুটি বাড়িয়ে কমিয়ে এক্ষেত্রে সেমিকন্ডাক্টরের পরিবাহিতা বাড়ানো বা কমানো যায়– অধিক পি-টাইপ বা স্বল্প পি-টাইপ করা যায়, তেমনি অধিক এন-টাইপ বা স্বল্প এন-টাইপও করা যায়।

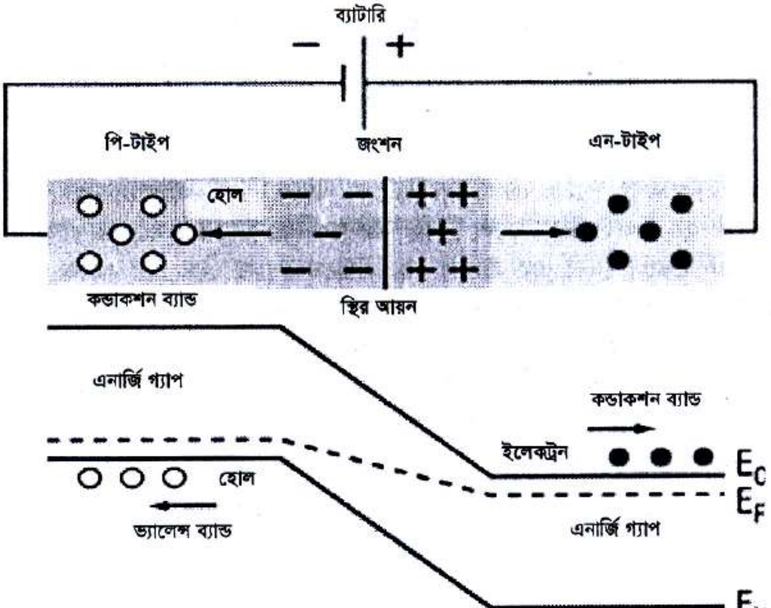

উপরেঃ একটি সেমিকন্ডাক্টরে পি-এন জংশন। এর সঙ্গে ব্যাটারি থেকে জংশনের মধ্যদিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবার মত দিকে ভোল্টেজ দেয়া হয়েছে।
নিচেঃ উপরে চিত্রের বরাবর নিচের বিভিন্ন অংশে ব্যান্ড গুলো জংশনের কারণে বেঁকে যায়। এর ফলেই ইলেকট্রনিক যন্ত্র হিসেবে কাজগুলো সম্ভব হয়।

এমনি পি-টাইপ ও এন-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরকে পরস্পর ঘনিষ্ট সংযোগে এনে উভয়ের মিলন স্থলে যে পি-এন জংশন তৈরি হয় তার গুণাগুণের কারণেই আধুনিক ইলেকট্রনিক্স সম্ভব হয়েছে। কম্পিউটার সহ যাবতীয় ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের মূলে রয়েছে ডায়োড, ট্রানজিস্টর, আইসি ইত্যাদি– যেগুলো এই পি-

এন জংশন দিয়েই গড়া। ভাবতে অবাক লাগে এমন সব জিনিসের মূলে আছে বিজাতীয় দূষণ পরমাণু হিসেবে ক্রীষ্টালের কিছু ত্রুটি।

অতিপরিবাহী বস্তু

কঠিন পদার্থের বহু রকম গুণাগুণের মধ্যে আমরা তার শক্ত হবার গুণ এবং বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার গুণের মত কয়েকটি মাত্র বেছে নিয়েছি– তাও ক্রীষ্টালের ত্রুটিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাগুলো তুলে ধরাটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেই প্রসঙ্গে আমরা বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার একটি চরম রূপ অতিপারিবাহিতার প্রসঙ্গে চলে এসেছি। এই গুণটি বেশ ব্যতিক্রমী এবং ভবিষ্যতের জন্য বেশ সম্ভাবনাময়। এক্ষেত্রে খুবই শীতল উত্তাপ সহ কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন কোন বস্তুর বৈদ্যুতিক রেজিষ্ট্যান্স (কারেন্টে প্রবাহে বাধা) শূন্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ এ অবস্থায় একটি কারেন্ট শুরু হলে তা বিনা বাধায় চলতেই থাকবে, কারেন্টের উৎস তুলে নিলেও কারেন্টের কিন্তু বিন্দুমাত্র অবক্ষয় হবেনা। উদাহরণ স্বরূপ ৪.২° কেলভিন উত্তাপের নিচে পারদ, ৩.৭৩° কেলভিন উত্তাপের নিচে টিন, এবং ৭.১৯ কেলভিন উত্তাপের নিচে সীসা অতিপরিবাহী বস্তুতে পরিণত হয়। এই উত্তাপগুলো সবই অত্যন্ত নিম্ন উত্তাপ। মনে রাখতে হবে কেলভিন স্কেলে দেয়া এই উত্তাপ সেলসিয়াসে পেতে হলে এর থেকে ২৭৩° বিয়োগ করতে হবে। তাপগতি বিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী সর্বনিম্ন যে উত্তাপ ০° কেলভিন বা পরম শূন্য তাত্ত্বিক ভাবে সম্ভব, যেই পরম শূন্যের খুব কাছাকাছি যাওয়া গেলেও একেবারে শূন্য উত্তাপে কখনো যাওয়া যাবেনা, অতিপরিবাহী হবার উত্তাপগুলো ঐ শূন্য উত্তাপ থেকে খুব বেশি উপরে নয়। অবশ্য অপেক্ষাকৃত কিছু বেশি উত্তাপেও কিছু বস্তুকে অতিপরিবাহী হতে পারে দেখা গেছে– তাও ২৩ কেলভিনের বেশি নয়– অর্থাৎ পরমশূন্যের মাত্র ২৩° উপরে। এসব অবশ্য ১৯৮৬ সনের আগের কথা– কারণ সে বছর সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম এক ধরনের অতিপারিবাহিতা আবিষ্কৃত হয়েছে যা বেশ কিছু উপরের উত্তাপেই ঘটতে পারে। সে কথায় পরে আসি। আপাতত দেখি সাধারণ যে অতিপরিবাহিতা যার সঙ্গে আমরা ১৯১১ সনে তার আবিষ্কার থেকেই পরিচিত, তার তাত্ত্বিক কারণটি কী? আবিষ্কারের বহু বছর পর ১৯৫৭ সালে এর পেছনে কী তত্ত্বটি কাজ করছে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই তত্ত্বটিকে বলা হয় বি সি এস তত্ত্ব– বার্ডীন, কুপার আর শ্রাইফার এই তিনজন বিজ্ঞানীর নামে যাঁরা সফল ভাবে এই তত্ত্ব দিয়েছিলেন।

আমরা আগে দেখেছি যে পরিবাহিতার যে বাধা বা রেজিষ্ট্যান্স তা দেখা দেয় পরিবাহী ইলেকট্রনগুলো বিক্ষিপ্ত হবার নানা কেন্দ্র যেমন বিজাতীয় পরমাণু,

পরমাণু কম্পন, ইত্যাদির উপস্থিতি সত্ত্বেও এর কোন কিছু দিয়ে বিক্ষিপ্ত হবেনা, তা হলে অতিপারিবাহিতাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ঠিক এমনি একটি পরিস্থিতিই অতিপরিবাহিতার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়। ঐ পরিস্থিতিতে ক্রীষ্টালে সাজানো পরমাণু (আয়ন) বিন্যাসের প্রভাবে দুটি ইলেকট্রন তাদের পারস্পরিক বৈদ্যুতিক বিকর্ষণকে তুচ্ছ করে বরং অভাবনীয় ভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং একটি ইলেকট্রন জোড়া গঠন করে, যাকে বলা হয় কুপার পেয়ার। এরকম কুপার পেয়ারের বন্ধন শক্তির কারণে ইলেকট্রনগুলোর শক্তি হ্রাস পায়। জোড়া হয়ে সামগ্রিক ভাবে পূর্ণ সংখ্যক স্পিন লাভ করাতে কুপার পেয়ার একটি বোসনে পরিণত হয়। আগের বইয়ে কণিকার আলোচনায় এভাবে বোসন হবার বিষয় আমরা দেখেছি। বোসনগুলো সবই একেবারে নিম্ন শক্তি মাত্রায় একত্রে থাকতে পারে। এর ফলে ঐ পরিস্থিতিতে ধাতুটির ইলেকট্রন ব্যান্ড বিন্যাসে কন্ডাকশন ব্যান্ড দুভাগে ভাগ হয়ে তার মাঝে একটি নূতন ধরনের শক্তি ব্যবধান বা এনার্জি গ্যাপ সৃষ্টি হয়। এই এনার্জি গ্যাপের উপরের শক্তি অবস্থাগুলোতে কোন ইলেকট্রন থাকেনা, আর নিচের শক্তি অবস্থাগুলোতে ইলেকট্রন থাকে এটি অনেকটাই সেমিকন্ডাক্টরের এনার্জি গ্যাপের মতই। আমরা আগে দেখেছি সাধারণ অবস্থায় ধাতুর ইলেকট্রন ব্যান্ডে এমন ব্যবধান বা এনার্জি গ্যাপ থাকার কথা নয়। তবে সেমিকন্ডাক্টরে যেই এনার্জি গ্যাপ রয়েছে, ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে ব্যান্ডগুলো সাধারণ নিয়মে সরার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাপটিও সরে যায় না। কিন্তু অতিপরিবাহী বস্তুর এই গ্যাপও কিন্তু সরে যায়। এই নূতন ব্যাপারটির ফলশ্রুতিতে যা দাঁড়ায় তা হলো কোন অবস্থাতেই ইলেকট্রন আর বিক্ষিপ্ত হতে পারেনা। গ্যাপের নিচের ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রন যে ভাবেই উপরের খালি ব্যান্ডে যাবার চেষ্টা করুক না কেন সেটি হয় গ্যাপের ভেতর নিষিদ্ধ অঞ্চলে গিয়ে শেষ হয়, অথবা গ্যাপ সরে যাওয়ার ফলে আবার সে ভর্তি জায়গায় গিয়ে শেষ হয়, অথবা ঐ পরিস্থিতিতে তার গ্যাপ অতিক্রম করার মত শক্তিই থাকেনা। কাজেই উপরের খালি ব্যান্ডে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হবার যতগুলো সম্ভাব্য প্রক্রিয়া রয়েছে কোনটিই তার পক্ষে সম্ভব হয়না। অথচ ব্যান্ডগুলোর সরে যাওয়ার কারণে কারেন্ট চলতেই থাকে, এর মধ্যে রেজিষ্ট্যান্স সৃষ্টির কোন সুযোগ ছাড়াই। তাই কারেন্ট একবার শুরু করে দিলে নির্বাধ ভাবে চলতেই থাকে। এটিই বি সি এস থিওরির মর্মকথা।

অতিপারিবাহিতার বাস্তব ফলাফল এবং তার প্রয়োগ সম্ভাবনা কিন্তু অত্যন্ত চমকপ্রদ। বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী স্থানে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার সময় প্রচুর শক্তি অনিবার্যভাবে অপচয় হয় নেবার পথে পরিবাহী তারের রেজিষ্ট্যান্সের কারণে সেটি যদি অতিপরিবাহী হয় তা হলে বিন্দুমাত্র অপচয় আর হবেনা।

অতিপরিবাহী তার দিয়ে বিদ্যুৎ-চুম্বক তৈরি করলে ক্ষয়হীন বিশাল কারেন্ট সৃষ্টি করে অতি শক্তিশালী চুম্বক পাওয়া সম্ভব। এই চুম্বক দিয়ে পুরো ট্রেনকে রেল রাস্তা থেকে আলগা করে খানিকটা ভাসিয়ে তুলে ঘর্ষণহীন উচ্চ বেগ ও নিম্ন শক্তি চাহিদার ট্রেন চলাচল সম্ভব (ম্যাগলেভ)। অপচয়হীন জেনারেটর বা মোটরে খুবই সামান্য বিদ্যুৎ ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার সম্ভব। এসব অনেক অনেক চমকপ্রদ প্রয়োগ এর হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো ঐ রকম নিম্ন উত্তাপ সৃষ্টি করা এবং পুরো ব্যবস্থাকে ক্রমাগত ঐ উত্তাপে রাখা অত্যন্ত দুরূহ আর ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের একটি দুয়ার খুলে গেছে ১৯৮৬ সালে উচ্চ-উত্তাপ অতিপরিবাহিতার আবিষ্কারের ফলে। বি সি এস থিওরি অনুযায়ী ৩০° কেলভিনের চেয়ে অধিক উত্তাপে কোন বস্তু অতিপরিবাহী হতে পারেনা। কিন্তু ১৯৮৬ সালে বিভিন্ন কয়েকটি বস্তুর সমন্বয়ে এমন অতিপরিবাহী বস্তু তৈরি সম্ভব হলো যা এর চেয়ে বেশ খানিকটা বেশি উত্তাপেই সাধারণ অবস্থা থেকে অতিপরিবাহী অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে। এর পর থেকে ক্রমে আরো কিছু কিছু বেশি উত্তাপে এই রূপান্তর ঘটতে পারে এমন অতিপরিবাহী বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। স্পষ্টত এই নূতন বস্তুগুলোতে যে অতিপরিবাহিতা দেখা যাচ্ছে তা একটি নূতন ধরনের ব্যাপার, যাকে বলা হয় উচ্চ-উত্তাপ অতিপরিবাহিতা বা হাই টি সি (ট্রানজিশন টেম্পারেচর) সুপারকন্ডাক্টিভিটি। অবশ্য উচ্চ উত্তাপ মানে কিন্তু এখানে গরম কিছু বুঝাচ্ছেনা, এমন কি ঘরের ভেতরের সাধারণ উত্তাপও বুঝাচ্ছেনা, বরং এও অতি শীতল উত্তাপ যদিও অতিপরিবাহিতার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ববর্তী উত্তাপগুলোর চেয়ে বেশি। তাই কিছুটা ব্যয় সাশ্রয়ী ভাবেই এই শেষোক্ত উত্তাপগুলোতে নেমে আসা যায়, যেমন বাণিজ্যিকভাবে সুলভ তরল বাতাস ব্যবহার করে এই উত্তাপে কোন কিছুকে শীতল করা যায়। ভবিষ্যতে হয়তো শীতল করতেই হবেনা, একেবারে সাধারণ ঘরের উত্তাপেই এটি সম্ভব হতে পারে– তখন অতিপরিবাহিতার প্রয়োগ হয়ে পড়বে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

১৯৮৬ সালের উচ্চ উত্তাপ অতিপরিবাহিতার প্রথম আবিষ্কারের সময় ল্যানথেনাম বেরিয়াম কপার অক্সাইডের সমন্বয়ে একটি সিরামিক বস্তুতে ৩০° কেলভিন উত্তাপে অতিপরিবাহিতা দেখা গেছে। বলা বাহুল্য সিরামিক ধরনের বস্তু, যা কিনা চীনামাটির তৈজস দ্রব্যাদির মত, তা মোটেই পূর্ববর্তী ধাতব অতিপরিবাহী বস্তুগুলোর মত নয়। মাত্র দু'এক বছরের মধ্যে ইয়েট্রিয়াম বেরিয়াম কপার অক্সাইডের সমন্বয়ে আর একটি সিরামিকে এক লাফে উত্তাপটি ৯৩° কেলভিনে গিয়ে পৌছেছে। এতে একটি বড় সুবিধা হয়ে গেল। নানা কাজে তরল নাইট্রোজেন (যার স্ফুটনাংক ৭৭° কেলভিন) সস্তা শীতলীকারক হিসেবে

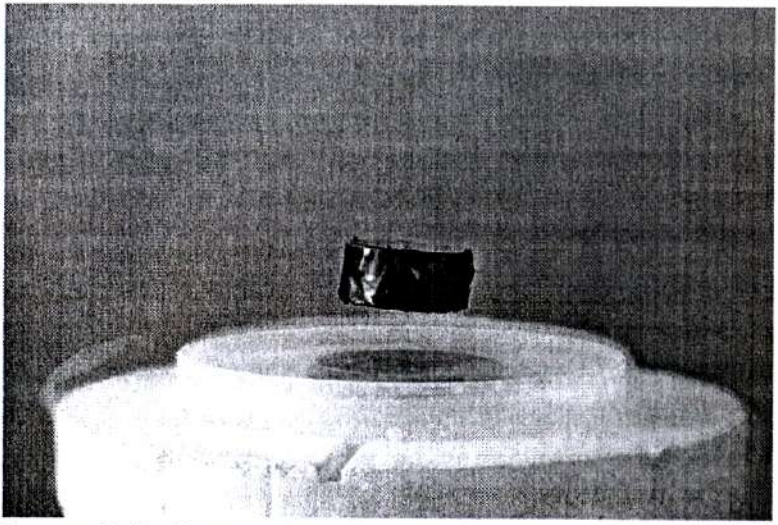

শীতল হয়ে অতিপরিবাহী হয়ে পড়াতে ট্যাবলেটের আকারের সিরামিক বস্তুটি বিশেষ চৌম্বকত্ব লাভ করে শূন্যে ভাসছে। নিচে ফ্লাস্কে তরল নাইট্রোজেন একে ঠান্ডা করেছে। ওখানে একটি চুম্বকও আছে।

ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; তাই এর ব্যবহার করেই ঐ ৯৩° কেলভিনে সহজে নেমে আসা যায়। এখন উচ্চ উত্তাপ অতিপারিবাহিতার প্রয়োজনীয় উত্তাপ ১৩৫° কেলভিনে উন্নীত হয়েছে। আগের বিচারে এটি যথেষ্ট উচ্চ হলেও ভুলে গেলে চলবেনা যে এটিও খুব শীতল উত্তাপ– বরফের গলনাঙ্কের ১৩৮ ডিগ্রি নিচে। তারপরও বলা যায় যে অনেক রকম প্রয়োগের জন্য এমন শীতল করতে হওয়াটি বড় সমস্যা নয়।

অন্যদিকে মনে রাখতে হবে যে সিরামিক জাতীয় বস্তু খুব ভঙ্গুর প্রকৃতির (বাসন-কোসনের ক্ষেত্রে এ কথা কে না জানে); তাই এগুলো দিয়ে বৈদ্যুতিক বর্তনী তৈরি করা মোটেই সহজ নয়। এটি দিয়ে সরু দীর্ঘ তার তৈরি করার সমস্যাটিই ধরা যাক। তারপরও এখন প্রযুক্তি এগিয়ে যাচ্ছে– কিলোমিটার দীর্ঘ ব্যবহারযোগ্য সিরামিক তার তৈরি এখন সম্ভব হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে আমাদের তড়িৎ-প্রকৌশলের অনেক কিছুই অতিপরিবাহিতার সুযোগ নিয়ে অনেক গুণে দক্ষ ও সাশ্রয়ী হয়ে পড়বে এটি আশা করা যায়।

বর্তমানে উচ্চ উত্তাপ পরিবাহিতার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক সমস্যাটিও বড়। সনাতন অতিপরিবাহিতার ব্যাখ্যা বি সি এস থিওরি দিয়ে করা হয়েছে সেটি আমরা দেখেছি। কিন্তু উচ্চ উত্তাপ অতি পরিবাহিতার ক্ষেত্রে সেটি যথেষ্ট নয় এজন্য নানা নূতন তত্ত্ব দেয়ার চেষ্টা চলছে, কোনটিই এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

জীবনের রসায়ন

জীবনের পেছনে রাসায়নিক কার্যকলাপ

আধুনিক বিজ্ঞানের উন্মেষের পরও বহুদিন জৈব প্রক্রিয়ার সঙ্গে রসায়নের কোন সম্পর্ক বিজ্ঞানীরা দেখতে পাননি। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে তখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল প্রাণ একটি প্রাণ-শক্তি বা আত্মার বিষয়, সাধারণ বস্তু-প্রকৃতির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। তাঁরা মনে করতেন দেহের প্রক্রিয়াগুলো ঐ প্রাণ-শক্তির প্রভাবেই কাজ করে। একে পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের জানা নিয়ম-কানুন দিয়ে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা নিরর্থক। রসায়ন সাধারণত যে পদার্থগুলো নিয়ে কাজ করে তার সঙ্গে জীব দেহের পদার্থগুলোর হুবহু মিল রয়েছে একথা তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি। কিন্তু ক্রমেই প্রাণের বিজ্ঞান নিয়ে এই ধরনের মতবাদের পরিবর্তন আসছিল। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীতে এসেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় বিষয়গুলোকে জানা বিজ্ঞানের আলোকে দেখার প্রবণতা দেখা যায়, যদিও কাজটি সহজ ছিলনা।

উদাহরণ স্বরূপ ১৮২৮ সালে জার্মান রসায়নবিদ ফ্রেডরিক বোহলার সাধারণভাবে রসায়নে ব্যবহৃত একটি অজৈব দ্রব্য এমোনিয়াম সায়ানেটকে উত্তপ্ত করে একে ইউরিয়াতে পরিণত করেন। কিন্তু এই ইউরিয়া হলো দেহজাত একটি পদার্থ যা মূত্র থেকে পাওয়া যায়। কাজেই জৈব পদার্থ নেহাৎ অজৈব পদার্থেরই রূপান্তর যার মধ্যে প্রাণ-শক্তির মতো কিছু যোগ করতে হয়না– এমন চিন্তা করার অবকাশ ঘটলো। এ ভাবে ধীরে ধীরে দেহের অংশ ও দেহজাত বস্তুগুলো রসায়নের জানা নিয়ম কানুনের আওতায় চলে আসতে থাকে। এটি এত এগিয়ে যায় যে প্রাণ-রসায়ন বা বায়োক্যামিষ্ট্রি নামে রসায়নের একটি নূতন দিকের চর্চা এরপর দ্রুত এগিয়ে গেল। এর মধ্যে বড় ভূমিকা পালন করলো জীবাণু, অসুখের কারণ হিসেবে জীবাণু ঘটিত রাসায়নিক পরিবর্তন, এ ধরনের অসুখে ওষুধের আবিষ্কার, এ ওষুধের ক্রিয়া আবিষ্কার ইত্যাদি বিষয়গুলো। বিরাট অগ্রগতি ঘটলো যখন ওষুধের জন্য শুধু প্রাকৃতিক উদ্ভিদ, প্রাণি, বা অণুজীবের উপর নির্ভর না করে ঐগুলোই রাসায়নিক পদ্ধতিতে ল্যাবোরেটরিতে সংশ্লেষণ সম্ভব হলো।

শরীরে সব কাজের কাজি প্রোটিন

যে কোন জীবের শরীরে প্রধানত থাকে প্রোটিন নামের নানা রাসায়নিক পদার্থ। অত্যন্ত ভারী ও জটিল অণু এই প্রোটিনগুলোর। জীবদেহে দু'রকম দায়িত্ব পালন করার মত প্রোটিন থাকে। এক ধরনের দায়িত্ব হলো দেহ গঠন। শরীরের পুরো গঠনটিই – বিভিন্ন অঙ্গ, পেশি, হাড় সবকিছুই– প্রধানত নানা রকম প্রোটিনে গড়া। এগুলোকে বলা যায় গঠনের প্রোটিন। স্বাভাবিক ভাবেই এদের অবদান হলো যার যার কাজের উপযুক্ত করে শক্ত সমর্থ বা নমনীয় অবয়ব তৈরি করা। কিন্তু আরো যে বহু রকমের প্রোটিন ভিন্ন এক রকম দায়িত্ব পালন করে তা আরো চমকপ্রদ। এই দায়িত্ব হলো প্রাকৃতিক ক্যাটালিষ্ট হিসেবে কাজ করা শরীরের নানা রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বাস্তবায়ন করার জন্য। এদেরকে সাধারণত বলা হয় এনজাইম। জীবদেহের সব কাজ নির্বাহ করে অনেক রকমের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব রাসায়নিক বিক্রিয়া। ঐ সব এক একটি বিক্রিয়ার পেছনে চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে এক একটি বিশেষ এনজাইম – যা কিন্তু এক একটি প্রোটিন ছাড়া কিছু নয়। এখানে আমরা এই ধরনের প্রোটিনের কাজের কথাটি বুঝার চেষ্টা করবো– কারণ এরাই তো জীবদেহের সব কাজের কাজি।

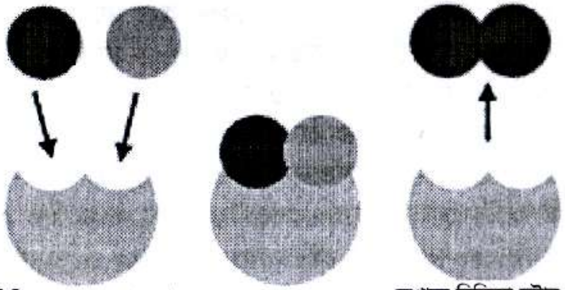

ক্যাটালিষ্ট হিসেবে এনজাইমের কাজ

এনজাইমগুলো সাধারণত এমন প্রোটিন যেগুলো জলীয়-দ্রবণে থাকে। এদের জটিল আণবিক গঠনের মধ্যে থাকে এক একটিতে এক এক বিশেষ জটিল আকৃতির খাঁজ। এই খাঁজকে বলা যায় বিক্রিয়ার সক্রিয় স্থান। ঐ বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে ক'টি পদার্থের অণু অংশগ্রহণ করে তার বিশেষ একটি এই খাঁজে হুবহু মিলে যায়। একটি তালার সঙ্গে যেমন একটি চাবিই শুধু পুরোপুরি মিলে গিয়ে তালাটি খুলতে পারে, সে রকম বিক্রিয়ার সেই সঙ্গে শুধু

এই এনজাইমের খাঁজটিই মিলে যায় বলে এটিই পদার্থের অণুর খুব দক্ষ ক্যাটালিষ্ট হিসেবে ঐ বিক্রিয়ার গতি ও দক্ষতা অনেকগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে। বলতে গেলে শরীরের বিভিন্ন জরুরী বিক্রিয়া এই এক একটি এনজাইমের কল্যাণেই আশ্চর্যজনক গতিতে সম্পন্ন হতে পারে।

যেমন অ্যাডেরনালাইন নামক হরমোনটির কথা চিন্তা করা যাক। আডেরনাল গ্ল্যান্ড নামক গ্রন্থি থেকে এই হরমোনটি তখনই নি:সৃত হয় যখন কোন ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই হরমোনের প্রভাবে ভীতির উৎসের বিরুদ্ধে হয় লড়াই করার অথবা এর থেকে দ্রুত পলায়ন করার একটি তাড়না মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াটি ঘটে জীবকোষের ভেতর বিভিন্ন কয়েকটি এনজাইমের খাঁজের সঙ্গে এই অ্যাডারনালাইন অণুর হুবহু মিলে যাবার ফলে পর পর কয়েকটি বিক্রিয়ার ফলে। এগুলোর ফলে শেষ পর্যন্ত যা ঘটে তা হলো কোষের কোষরসে (সাইটোপ্লাজম) থাকা ক্যালসিয়াম আয়নের সঞ্চয় থেকে এই আয়ন নি:সৃত হয়ে কিছু পেশির সক্রিয়তা সৃষ্টি। এর মধ্যে রয়েছে হার্টের পেশি যার ফলে হার্টবিট দ্রুততর হয়, রক্তচাপ বেড়ে যায়। ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির মোকাবেলায় শরীরে এমনটিই ঘটে। এই যে পুরো প্রক্রিয়া এটি উদ্ঘাটন করে একটি লাভ হয়েছে যে এতে বীটা ব্লকার নামে পরিচিত হার্টের ওষুধের আবিষ্কার সম্ভব করেছে। এর মূলে কাজ করেছে এমন কোন অণু আবিষ্কার করার চেষ্টা যা অ্যাডেরনালাইনের দ্বারা হার্টকে উত্তেজিত করার প্রক্রিয়ার উল্টো দিকে কাজ করবে। শুধু তাই নয় ঐ অ্যাডেরনালাইনের সদৃশ অন্য কিছু অণুরও উল্টো দিকে কাজ করবে। অ্যাডেরনালাইন ও তার সদৃশ অণুর যে প্রতিক্রিয়া হার্টের উপর হয় তা কিন্তু হার্টের অসুখ এনজিনার প্রতিক্রিয়ার মত একই। বীটা ব্লকার ওষুধের অণুটি হার্টের কোষে বিশেষ এনজাইমগুলোর খাঁজে ফিট করার ব্যাপারে ঐ অ্যাডারনালাইন বা অ্যাডারনালাইন সদৃশ অণুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এই প্রতিযোগিতার ফলেই এগুলো এনজিনাকে নাকচ করে হার্টকে রক্ষা করতে পারে।

প্রোটিনের গঠন

এনজাইম কী ভাবে তার গঠনের জটিল খাঁজ ব্যবহার করে খুবই সূক্ষ্মভাবে এক একটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার সম্পাদন ঘটায়, তার আলোচনা থেকে আমরা বুঝেছি প্রোটিনের জটিল গঠনটি এক্ষেত্রে কতই প্রাসঙ্গিক। প্রোটিনের মৌলিক গঠনটি হলো এটি একটি পলিমার– অর্থাৎ সরলতর একই বা সদৃশ অণু পর পর চেইনের মত সংলগ্ন হয়েই এটি গঠিত হয়। এই সরলতর অণুগুলো হলো এক্ষেত্রে এমাইনো এসিড। এমাইনো এসিড অণুগুলো কয়েক রকমের,

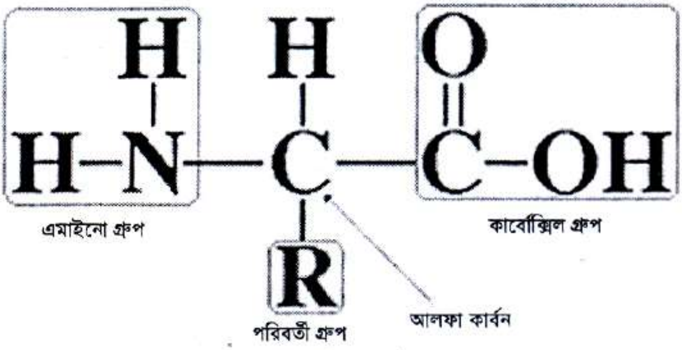

এমাইনো এসিডের গঠন

যেগুলো মূলত সদৃশ কিন্তু কিছুটা ভিন্ন। এরকম এমাইনো এসিড রয়েছে ২০টি। এর প্রত্যেকটি একটি কেন্দ্রীয় কার্বন পরমাণুর (আলফা কার্বন) সঙ্গে সংলগ্ন ৪টি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এই চারটি গ্রুপ হলো হাইড্রোজেন (-H), এমাইনো গ্রুপ ($-NH_2$), কার্বোক্সিল গ্রুপ (-COOH), এবং একটি পরিবর্তী গ্রুপ যা এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম হতে পারে (-R)। এরকম বেশ কিছু এমাইনো এসিড পরস্পর পেপটাইড বন্ধন নামক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রোটিনের ঐ চেইন গঠন করে। একই এমাইনো এসিড বার বার চেইনে থাকতে পারে, ভিন্ন রকমেরও থাকতে পারে। এভাবে ঐ ২০টি এমাইনো এসিড থেকে নিয়ে অনেকগুলো পর পর সংলগ্ন হয়ে অসংখ্য রকম প্রোটিন গঠিত হতে পারে। এক একটি প্রোটিনে এমাইনো এসিড কতটি থাকবে তাও বিভিন্ন প্রোটিনে বিভিন্ন। ছোট প্রোটিনের ক্ষেত্রেও এই সংখ্যা একশ'টির কম নয়। কাজেই প্রোটিন মূলত খুব বড় অণু। পরে দেখবো এটি খুব জটিল অণুও বটে।

এমাইনো এসিডের এই শেকল বা চেইন প্রোটিনের প্রাথমিক গঠন মাত্র। সত্যিকার প্রোটিন কিন্তু শুধু এমাইনো এসিডের একটি চেইন মাত্র নয়, বরং ঐ চেইনের বহু বার বহু জটিল ভাবে ভাঁজ হওয়া একটি ত্রিমাত্রিক গঠন, এসব ভাঁজের প্রকৃতির উপর যার গুণাগুণ নির্ভর করে। ঐ প্রাথমিক রাসায়নিক গঠন জানা থাকলেও ১৯৩১ সালের আগে প্রোটিন গঠনের শেষোক্ত বিস্তারিত দিকগুলো জানা সম্ভব ছিলনা। পরবর্তীতে এটি সম্ভব হয়েছে এক্সরে ক্রীষ্টালোগ্রাফির উন্নত ব্যবহারের ফলে। এই এক্সরে ক্রীষ্টালোগ্রাফির মাধ্যমেই পঞ্চাশের দশকে কিছু কিছু প্রোটিনের বিস্তারিত ত্রিমাত্রিক গঠন আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

দেখা গেছে যে একটি বিশেষ প্রোটিন কীভাবে ভাঁজ হবে তা নির্ভর করে ঐ পলিমার চেইনে কোন এমাইনো এসিডের পর কোন এমাইনো এসিড আসে তার উপর। এই এমাইনো এসিড ক্রমটিই বলে দেয় প্রোটিনের গঠনের সব কিছু। আর এই ক্রমের প্রায় এক লক্ষ রকমের বৈচিত্র সম্ভব; যার প্রত্যেকটিরই একটি সুনির্দিষ্ট ভাঁজের ভঙ্গি রয়েছে। এতো রকম বিকল্প ভাঁজ গঠনের মধ্য থেকে সঠিক গঠনটি প্রত্যেক প্রোটিন কী ভাবে খুঁজে নেয় সেটি একটি বড় রহস্য। যেমন একটি ছোট খাট প্রোটিনের কথাও যদি চিন্তা করি তাতে অন্তত ১০০টি এমাইনো এসিড থাকবে তার চেইনে। ভাঁজের সম্ভাব্য বিকল্প দাঁড়াবে তাতে $১০^{৪৯}$ টি। এতগুলো ভাঁজ পর পর পরীক্ষা করে সঠিক ভাঁজটি নেয়া সময়ের দিক থেকে অসম্ভব। এটি আসলে সম্ভব হয় বিভিন্ন ভাঁজের প্রয়োজনীয় তুলনীয় শক্তিগুলোর সমন্বয় এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে এর মধ্যে চেইন অনেকটা সরাসরি ভাবেই যথাযথ ভাঁজটিতে চলে যেতে পারে এক লাফে।

প্রোটিনের গঠন

এভাবে প্রোটিন গঠনের তিনটি পর্যায় ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়টি হচ্ছে এমাইনো এসিড ক্রমটি যেটি এক মাত্রিক একটি চেইন মাত্র, অথচ এর মধ্যেই রয়েছে গঠনের পরবর্তী পর্যায়গুলোর বীজ। দ্বিতীয় পর্যায়টি হচ্ছে এই চেইনের এক রকম মৌলিক ভাঁজ। এটি দুভাবে হতে পারে। একটি হলো হেলিক্স বা সর্পিল প্যাঁচানো আকারের যাকে বলা হয় আলফা হেলিক্স। অন্যটি হলো বেণী গাঁথার মত পাট করা ভাঁজ যা একটা সমতল শীটের মত– যাকে বলা হয় বীটা-প্লীটেড শীট। সর্বশেষ পর্যায়টি হলো ঐ হেলিক্স বা শীটকে আরো নানা দিকের ভাঁজ দিয়ে একেবারে ত্রিমাত্রিক চূড়ান্ত জটিল আকৃতিতে আনা।

এত বেশি জটিল আকৃতির এবং বৈচিত্রের প্রোটিন অণুগুলোর প্রকৃত গঠন আবিষ্কার করতে পারা আধুনিক পদ্ধতিগুলোর বিশেষ করে এক্সরে ক্রীষ্টালোগ্রাফীর একটি বিশাল কৃতিত্ব। প্রশ্ন উঠতে পারে এত কষ্ট করে এই জটিল গঠনটি জানার প্রয়োজনটি কী? এপ্রশ্নের কারণ কোন একটি বিশেষ প্রোটিনকে আমরা যদি কৃত্রিম ভাবে তৈরি করতে চাই, তা হলে তার পুরো গঠন জানার প্রয়োজন নেই, শুধু এমাইনো এসিড ক্রমটি জানলেই চলে। সেই ক্রমটি পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে পারলে এটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে তার নিজস্ব ভাঁজগুলো নিয়ে ত্রিমাত্রিক প্রোটিন গঠনে পরিণত হবে। এভাবে ইনসুলিনের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন 'সিনথেটিক' রূপে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত গঠন জানাটি দরকার হয়ে পড়ে যদি আমরা ঐ গঠনে কিছু পরিবর্তন এনে নূতন কিছু পেতে চাই। অথবা এর ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নূতন কোন প্রোটিন তৈরি করতে যদি তার ডিজাইন করতে চাই, তা হলে পুরো ব্যাপারটি জানতে হবে বৈ কি। সাম্প্রতিককালে মানুষের ডি এন এ'র পরিপূর্ণ উদ্ঘাটন হয়েছে, যার ফলে ডি এন এ'র কোডগুলো দিয়ে শরীরে যত রকম প্রোটিন অর্থাৎ এমাইনো এসিডক্রম তৈরি হতে পারে, সবগুলো এখন জানা সম্ভব হচ্ছে। এর মধ্যে অনেকগুলো প্রোটিনকে বাস্তবে পাওয়া যায়নি। কিন্তু যদি ঐ এমাইনো এসিড ক্রম থেকে সেই গঠনগুলো উদ্ঘাটন করা যায়, তা হলে তাদের সম্ভাব্য কাজও খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। তাছাড়া এখন ক্রমেই আবিষ্কৃত হচ্ছে যে বিশেষ বিশেষ প্রোটিনের গঠনে সামান্য কিছু পরিবর্তনের কারণে কোন কোন রোগের সৃষ্টি হয়। গঠনগুলো জানা থাকলে এমন রোগের প্রতিবিধান বের করাও সম্ভব হবে। আবার আলঝাইমার, ম্যাড কাউ ডিজিজ ইত্যাদি কিছু রোগের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শরীরে কোন কোন বিশেষ প্রোটিন অণুর ভাঁজগুলো খুলে যায় এবং ভাঁজখোলা অণুগুলো আঁশের মতো তালগোল পাকিয়ে অদ্রবণীয় ও বিষাক্ত বস্তুতে পরিণত হয়ে রোগ ঘটায়। প্রোটিনগুলোর প্রকৃত গঠন জানা থাকলে এসব রোগের নিরাময়তা উদ্ঘাটনে সহায়ক হবে।

ডি এন এ'র সঙ্কেতে প্রোটিন তৈরি

জীবকোষ প্রোটিন যেমন খুব বড় ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করে, তেমনি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ডি এন এ। প্রোটিন যেখানে জীবনের প্রায় সবকিছু কার্যকর করে– জীবদেহের গঠন, তার শারীরবৃত্ত, তার আচরণ সব কিছু ; সেই প্রোটিন তৈরি হয় কিন্তু ডি এন এ'র কোড অর্থাৎ এর মধ্যে সংকেত-বদ্ধ নীল-নক্সা অনুযায়ী। এই নীল-নক্সা জীব পায় তার পূর্বসূরি (বাবা-মা) থেকে, সেটি পুরো জীবদেহে কোষ থেকে কোষে হুবহু একই থেকে সঞ্চারিত হয় কোষ

বিভাজনে নূতন কোষ সৃষ্টির সময়। ডি এন এ'র বিস্তারিত গঠন, কাজ, ডি এন এ'র সাম্প্রতিকতম বিজ্ঞান নিয়ে বিশদ আলোচনা আমরা এখানে করবোনা; এখানে শুধু প্রোটিন তৈরিতে তার কাজটুকু দেখবো।

ডি এন এ নিজে সূতার মতো একটি দীর্ঘ অণু। এককোষী জীবের চেয়ে উন্নততর জীবের কোষে একটি কেন্দ্রীয় অংশ থাকে নিউক্লিয়াস নামে। ডি এন এ থাকে এই নিউক্লিয়াসের মধ্যেই। পুরো ডি এন এটি সাধারণত ক্রোমোজোম নামক অংশে দলা পাকিয়ে বান্ডিল করা অবস্থায় থাকে। আসলে ডি এন এ অণুতে দুটি সূতার মত দীর্ঘ অংশ পরস্পরের সঙ্গে সর্পিল ভাবে জড়িয়ে থাকে ডাবল হেলিক্স আকৃতিতে। প্রত্যেকটি সূতার সারা গায়েই কিছু পর পর অন্য সূতাটির দিকে এগিয়ে থাকে বেইস নামের একটি অংশ, বিপরীতে অন্য সূতাটি থেকেও আর একটি বেইস এগিয়ে এসে তার ঠিক সামনের অন্য সূতার বেইসটির সঙ্গে দুর্বল একটি বন্ধনে থাকে।

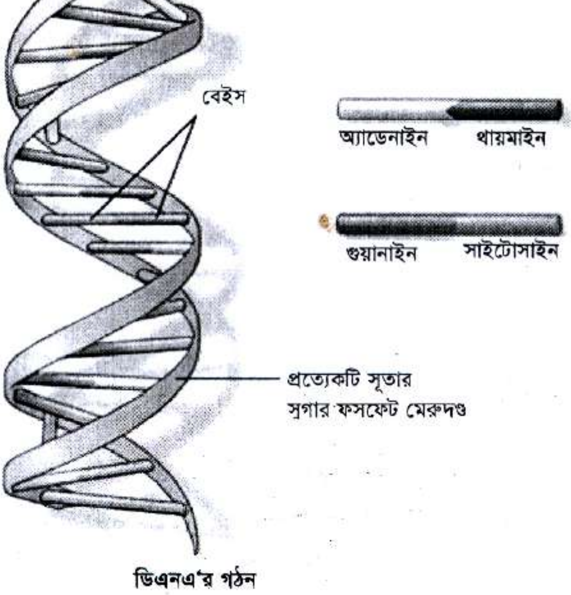

ডিএনএ'র গঠন

এই বেইসগুলো আসলে চার রকমের অণু– অ্যানিলাইন, থায়ামাইন, সাইটোসাইন ও গুয়ানাইন সংক্ষেপে A, T, C ও G। তবে একটি বাধ্যবাধ্যকতা হলো A এর বিপরীতে শুধু T থাকবে পরে অথবা T এর

বিপরীতে A। সেরকম C এর বিপরীতে শুধু G ই থাকতে পারে অথবা G এর বিপরীতে C। এভাবে প্রত্যেক সূতার লম্বালম্বি বরাবর এই A, T, C ও G, পর পর বিভিন্ন ক্রমে থাকে। একই ভাবে বিপরীত সূতায় তার বিপরীত একটি ক্রম থাকে– A এর বিপরীত স্থানে T, T এর বিপরীত স্থানে A, C এর বিপরীত স্থানে G, এবং G এর বিপরীত স্থানে C নিয়ে। একটি সূতার মধ্যে এগুলোর ক্রম জানলে তাই অন্যটির ক্রম এমনিতেই জানা হয়ে যায়।

ডি এন এ যখন প্রতিলিপি হয়ে নূতন কোষে যায় তখন, আর এটি যখন প্রোটিন তৈরির কাজ করতে চায় তখন, ক্রোমোজোমের বান্ডিল খুলে এবং হেলিক্সের প্যাঁচ খুলে দুটি সূতা বিভক্ত হয়ে এর যে কোন একটি থেকে ছাপ নেবার মত করে বিপরীত বেইসক্রম যুক্ত প্রতিলিপি তৈরি হতে পারে ওরকমই আর একটি ডি এন এ সূতায়। প্রত্যেক সূতাতে A, T, C, G, চারটি বেইস পর পর যে ক্রমে থাকে সেই ক্রমই ধারণ করে প্রোটিন তৈরির নীল-নক্সা। আমরা লেখার সময় কোন অক্ষরের পর কোন অক্ষর সাজাই তার উপর নির্ভর করে লেখাটির অর্থ। তেমনি ডিএনএতে ঐ বেইসগুলোর কোনটির পর কোনটি আছে, অর্থাৎ বেইস ক্রমের ভাষাতেই, প্রোটিন তৈরির কোডগুলো তার মধ্যে থাকে। আসলে পর পর তিনটি বেইস নিয়ে হয় একটি সুনির্দিষ্ট সংকেত বা কোডন যা একটি সুনির্দিষ্ট এমাইনো এসিডের সংকেত। এ যেন বাক্যের মধ্যে প্রতি তিনটি অক্ষর দিয়ে একটি অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি হওয়া।

এখন দেখা যাক ঐ সংকেতটি কার্যকর হয় কী ভাবে? এটি কিন্তু ডি এন এ যেখানে আছে অর্থাৎ কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে হয়না। বরং এটি ঘটে নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকা রিবোজোম নামে কোষের অন্য কিছু অংশে। ডি এন এ'র বেইস ক্রমের হুবহু একটি উল্টো ছাপ নিয়ে নিউক্লিয়াস থেকে বের হয়ে ঐ রিবোজোমের কাছে চলে যায়, প্রায় হুবহু ডি এন এ'র একটি সূতার মতই আর একটি অণু আর এন এ– যাকে ম্যাসেঞ্জার বা বার্তাবহ আর এন এ বলা হয়। কোষের মধ্যে থাকা নানা এমাইনো এসিডকে আর এন এ'র ঐ বেইস ক্রম অনুযায়ী খুঁজে নিয়ে রিবোজোম সেগুলো একটি মালার মত চেইনে গেঁথে যেতে থাকে। ডিএনএ'র ছাপ নিয়ে তৈরি বলে আর এন এ'তেও রয়েছে ডিএনএতে থাকা কোড অনুযায়ী ঐ যে তিনটি করে বেইসের সমন্বয়ে এক একটি কোডন যার এক একটি নির্দিষ্ট কোডন একটি নির্দিষ্ট এমাইনো এসিডকে সূচিত করে। সেই এমাইনো এডিডগুলো পর পর বসিয়ে রিবোজোমের কাছে রচিত হয়ে যায় পুরো প্রোটিনটির প্রাথমিক গঠন– দীর্ঘ চেইনের আকারে এমাইনো এসিডের ক্রম। সেই ক্রমের বৈশিষ্ট অনুযায়ী এই চেইন যথারীতি জটিল ভাবে ভাঁজ হয়ে গিয়ে চূড়ান্ত গঠনের প্রোটিনে পরিণত হয়। এভাবে পূর্বসুরি থেকে পাওয়া

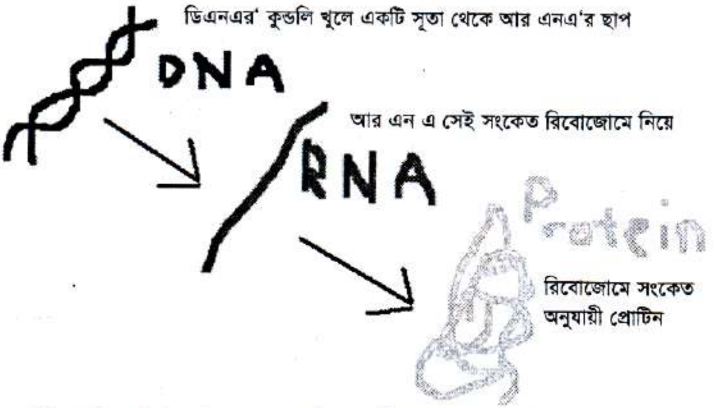

ডিএনএ'তে থাকা কোডের সংকেতে'র ছাপ নিয়ে আরএনএ চলে যায় কোষের রিবোজোমে। সেখানে সেই সংকেত অনুযায়ী তৈরি হয় প্রোটিন।

ডিএনএ সংকেত অনুসরণ করে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে যায় সব কাজের কাজি এক একটি প্রোটিন। এই যে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়ার ডিএনএ'র দুটি সূতা খুলে যাওয়া থেকে শুরু করে তার ছাপ নেয়া, আর এন এ'র বাইরে আসা, রিবোজোমে সেটি অনুযায়ী এমাইনো এসিড বেছে নিয়ে পর পর সাজিয়ে মালা গাঁথা– সবগুলো কাজ কিন্তু হয় ইতোপূর্বে সৃষ্ট নানা এনজাইমের সাহায্যে, যেগুলো নিজেরাও প্রোটিন। তাই ডিএনএ প্রোটিন তৈরি করে অন্য প্রোটিনের সাহায্যেই যেগুলোও ডি এন এ'র কোড অনুযায়ী এভাবেই তৈরি হয়েছে।

শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রোটিন তৈরির কোড বা নীল-নক্সা ঐ ডিএনএ'র মধ্যেই থাকে। এভাবে অসংখ্য প্রোটিনের কোনটি শরীরের নানা অংশের অবয়ব গড়ে– হাড়, মাংসপেশি, লিগামেন্ট রজ্জু, স্নায়ু তন্তু, ইত্যাদি নানান আকারে। আবার অন্য সব প্রোটিন এনজাইম ইত্যাদি রূপে শারীরবৃত্তের নানা কাজের সম্পাদন ঘটায়, এমনকি জীবের নানা আচরণেরও। প্রোটিন তৈরির সহায়ক এনজাইম তৈরির ব্যাপারতো আছেই। সবকিছুর মূলে রয়েছে ডিএনএ'র সংকেত। সংকেতটিও আবার মাত্র চারটি বেইস A, T, C, G, এর ক্রম মাত্র। বেইসের ক্রমের ভাষার সংকেত এভাবে রূপায়িত হয়ে যাচ্ছে এমাইনো এসিড ক্রমের বাস্তব প্রোটিনে – উভয়ের একটির ক্রম হুবহু অনুসরণ করছে অন্যটির ক্রমকে। জীবনের বিজ্ঞান, জীবনের রসায়ন এমনি ভাবেই কাজ করে যাচেছ। আজ একে বোঝার পথে আমরা আশ্চর্যজনক অগ্রগতি লাভ করতে পেরেছি। জীব অস্থায়ী, জীবদেহের সব কিছু অস্থায়ী। এমনকি জীবনের নীল-নক্সা ধারণকারী ঐ ডি এন এ অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর হাজার বছর পরেও অক্ষত থেকে

নীলনক্সা বজায় রাখলেও শেষ পর্যন্ত তার অবয়বও অক্ষত থাকেনা। কিন্তু নীল নক্সার যে সংকেত জীব ধারণ করে তা বংশে বংশে প্রবাহিত হয় বলে তা কিন্তু চিরস্থায়ী– যতদিন পৃথিবীতে কোন জীব থাকবে ততদিন। তাই জীবনের বিজ্ঞান ক্রমেই সেই সংকেতকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

ন্যানো-বিজ্ঞান ও ন্যানো-প্রযুক্তি

ন্যানো জগতের ভিন্ন নিয়ম

আমরা একক পরমাণু ও অণুর বিষয়ে জেনেছি, আবার পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় প্রায় স্বাধীন ভাবে তাদের ছুটাছুটি করার কথাও জানি। অন্যদিকে আমরা কঠিন পদার্থের টুকরায়, বিশেষ করে ক্রীষ্টালে, এই অণু-পরমাণুকে খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে ঘন সংবদ্ধ হয়ে থাকতে দেখেছি। এক একটি ক্রীষ্টালের যদিও নির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে তবুও তাত্ত্বিক হিসেবের জন্য এরকম ক্রীষ্টালকে অসীম জায়গায় ব্যাপ্ত হিসেবেই কল্পনা করে নেয়া হয়, পরমাণু বা অণুর আয়তনের তুলনায় ক্রীষ্টালটির আয়তন অনেক অনেক বড় বলে। এমনটি না হয়ে অল্প সংখ্যক অণু বা পরমাণু দিয়ে আমরা যদি ছোট আকারের বস্তু রচনা করি, তখন এর গুণাবলী যথেষ্ট বদলে যেতে পারে। আমরা দেখেছি পরমাণুর ব্যাস এক ন্যানোমিটারের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হয়ে থাকে সাধারণত। এরকম দশ বিশটা পরমাণু থেকে শুরু করে বেশ কয়েক হাজার পরমাণু পর্যন্ত নিয়ে এক একটি পরমাণুগুচ্ছের আকারে যদি পদার্থকে নেয়া যায় তা হলে সেই গুচ্ছের আকার কয়েক ন্যানোমিটারের পর্যায়েই হিসেবে করা যায়। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে এই আয়তনের বস্তু সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ দেখা গিয়েছে, কারণ এদের কিছু কিছু গুণাগুণ বেশ ব্যতিক্রমী। এই ব্যতিক্রমী গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও একটি নূতন দিগন্তের সৃষ্টি হয়েছে যা ভবিষ্যতে বহুদূর বিকশিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই ন্যানো আয়তনের বস্তু নিয়ে নূতন ন্যানো-বিজ্ঞান ও ন্যানো-প্রযুক্তির সূচনা হয়েছে।

ন্যানো সাইজের যন্ত্র

ন্যানো জগতের যে গবেষণা ও উন্নয়ন চলছে তার একটি দিক এসেছে জৈব রসায়নে ডিজাইন মত জটিল অণু রচনা করার ক্ষমতা থেকে। এখন এভাবে এমন সব অণু গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে যাকে একটি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের রূপ দেয়া যাচ্ছে। এতে বিভিন্ন পরমাণু-গ্রুপ বা অণু-গ্রুপের জৈব গুণাগুণকে ব্যবহার করে তাদেরকে একটি জটিলতর অণুতে এমন ভাবে সংযোজিত করা হয় যাতে তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে দুর্বল বন্ধন ও বিক্রিয়া থাকে; এবং ফলশ্রুতিতে একে একটি অতি ক্ষুদ্র আণবিক সাইজের যন্ত্রতে– যেমন একটি ঘূর্ণনক্ষম চাকা,

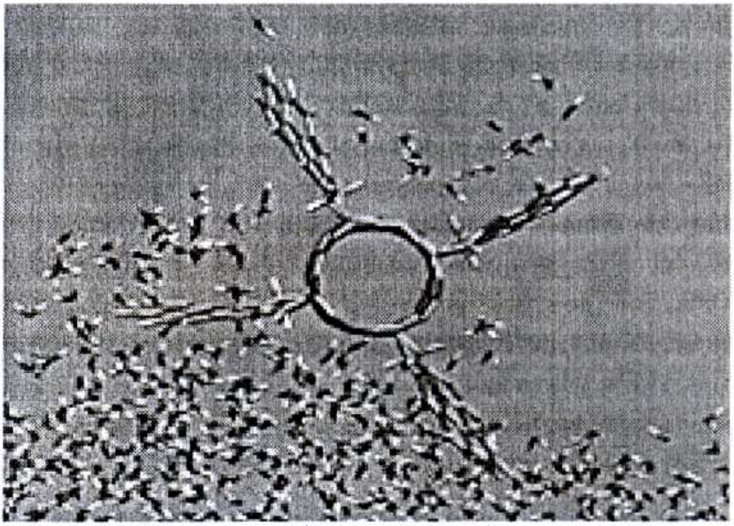

ন্যানো সাইজের যন্ত্রের সংশ্লেষণ

একটি লিভার, একটি দাড়ি পাল্লা, বা এরকম কিছুর-রূপ দেয়া সম্ভব হয়। এখনো এমন যন্ত্রপাতির আকারের অণু খুব বেশি তৈরি না হলেও এর সক্ষমতা সৃষ্টির দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এটি যদি নিয়মিতভাবে সম্ভব হয়, তবে হয়তো রক্ত প্রবাহের সঙ্গে গিয়ে এসব যন্ত্র সরাসরি বিশেষ জীবকোষের পর্যায়ে অস্ত্রোপচার করতে পারবে, অথবা ঠিক ওখানে ওষুধ সরবরাহ করতে পারবে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, অথবা আণবিক স্তরে ঘটা কাজকর্মে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

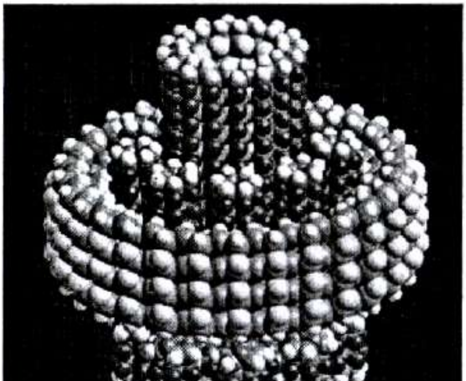

ন্যানো সাইজের চাকা ইত্যাদি

ন্যানোগুচ্ছ তৈরি

ন্যানো-বিজ্ঞানের গবেষণার অন্য একটি দিক হলো দশ বিশ, বা কয়েকশত কিংবা কয়েক হাজার পরমাণুর সমন্বয়ে গুচ্ছ তৈরি করা যাদেরকে বলা যায়

ন্যানোগুচ্ছ (ন্যানো ক্লাষ্টার)। ন্যানোগুচ্ছাকার পদার্থের আচরণে এমন কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বড় সম্ভাবনার সৃষ্টি করছে। ধাতব জিনিসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সাধারণ কঠিন পদার্থ অবস্থায় একটি বস্তুর যে স্বাভাবিক গলনাঙ্ক, ন্যানোগুচ্ছ অবস্থায় তা অনেক নেমে আসে। যেমন সোনার ক্ষেত্রে এটি কমে প্রায় একচতুর্থাংশে নেমে আসে। এভাবে অনেকগুলো ক্ষেত্রে গুণাগুণে পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনও অবশ্য আবার নির্ভর করে গুচ্ছটি কত ছোট বা বড় তার উপর। আসলে কঠিন পদার্থের অনেক গুণ নির্ভর করে তার অভ্যন্তরের পরমাণুর সংখ্যার তুলনায় তার পৃষ্ঠতলের পরমাণুর সংখ্যা কত বেশি বা কম তার উপর। ন্যানো গুচ্ছে পরমাণুর সংখ্যা যত কম হবে, অর্থাৎ গুচ্ছ যত ছোট হবে তার পৃষ্ঠতলের পরমাণুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে তত বেশি হবে। এভাবে চৌম্বক গুণ সহ আরো নানা গুণের ক্ষেত্রে ন্যানো গুচ্ছের আয়তন একটি বড় ভূমিকা নেয় এবং বিভিন্ন আয়তনের ন্যানোগুচ্ছ তৈরি করে গুণাগুণের এই পরিবর্তনকে চমৎকার ভাবে ব্যবহার করা যায়।

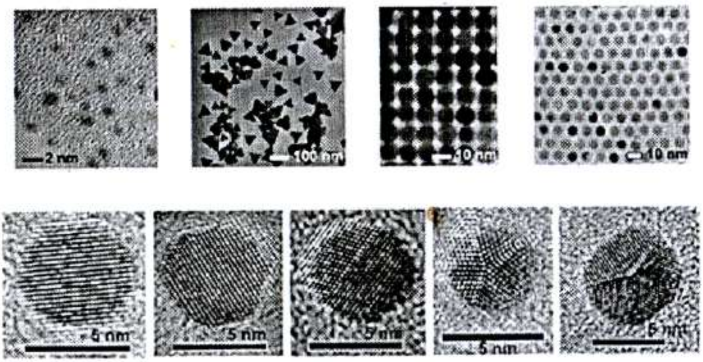

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা সোনা ও রূপার বিভিন্ন ন্যানোগুচ্ছ। উপরের সারিতে বেশ কিছু গুচ্ছ একসঙ্গে দেখা। নিচের সারিতে এক একটি গুচ্ছকে বিস্তারিত দেখা মাইক্রোস্কোপের অধিক বিবর্ধনে।

ন্যানোগুচ্ছ নানা ভাবে সৃষ্টি করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি উপায় অনুযায়ী সোডিয়াম ধাতুকে উচ্চ উত্তাপে বাষ্পীভূত করে ঐ বাষ্পের সঙ্গে একটি শীতল নিষ্ক্রিয় গ্যাস মিশিয়ে (নিয়ন, আরগন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাস কারো সঙ্গে বিক্রিয়া করেনা) তার মধ্যে ঠান্ডা হয়ে জমতে দেয়া হয়। ওভাবে জমার সময় বিভিন্ন আয়তনের ন্যানোগুচ্ছ সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে সৃষ্ট ন্যানোগুচ্ছগুলো নিজেরা উন্মুক্ত ও আবরণহীন থাকে বলে বেশি ঘন হয়ে থাকার সময় কয়েকটি ন্যানো গুচ্ছ কাছে এসে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে একত্র হয়ে যেতে পারে –ফলে তাদেরকে

আলাদা রাখা দুরূহ হয়। ন্যানোগুচ্ছ হিসেবে ছোট আকারে রেখে স্বকীয়তা বজায় রাখতে হলে এদের প্রত্যেকটি গায়ে একটি খোলস বা আবরণ সৃষ্টি প্রয়োজন যাতে একে অন্যের সঙ্গে মিশতে না পারে। এ জন্য ভিন্ন কিছু যৌগ ন্যানোগুচ্ছের চারদিকে যেন আবরণ সৃষ্টি করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে কার্বন ও অক্সিজেনের সমম্বয়ে কার্বোনাইল গ্রুপ এভাবে ধাতুর সঙ্গে মিশে ঐ ধাতুর আবৃত ন্যানোগুচ্ছ গঠন করতে পারে। তৈরির সময় বিভিন্ন আয়তনের ন্যানোগুচ্ছ সৃষ্টি হলে, তার থেকে একই আয়তনের গুচ্ছগুলোকে পৃথক করার পদ্ধতিও এখন বেশ উন্নত হয়েছে।

বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক কাজে ন্যানোগুচ্ছ

কোন তরল পদার্থের মধ্যে ক্ষুদ্র ভাবে বিভক্ত অবস্থায় অন্য কোন বস্তু ভাসমান থাকলে তাকে সাধারণত কলয়েড বলা হয়। ধাতব ন্যানোগুচ্ছ এরকম কলয়েড রূপেও থাকতে পারে। থিওল নামের পরমাণুর জৈব গ্রুপ দিয়ে আবৃত হয়ে সিলভার ন্যানোগুচ্ছ যখন কলয়েড অবস্থায় থাকে তখন তার থেকে মাত্র কয়েক ন্যানোমিটার পুরু চমৎকার পাতলা পর্দা তৈরি করা যায়। এখানে ন্যানোগুচ্ছগুলো এত কাছাকাছি থাকতে পারে যে পুরো পর্দাটি একটি ধাতব পর্দার মত কাজ করে। এ পর্দাতে চাপ দিয়ে যদি গুচ্ছগুলোকে পরস্পর আধ ন্যানোমিটার দূরত্বে আনা যায় এখন বৈদ্যুতিক কারেন্ট এদের একটি থেকে অন্যটিতে কোয়ান্টাম টানেলিং প্রক্রিয়ায় প্রবাহিত হতে পারে। আবার চাপ প্রত্যাহার করলে গুচ্ছগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেড়ে এই কারেন্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কার্যত এখানে আমরা আণবিক আয়তনের একটি বৈদ্যুতিক সুইচ পেয়ে যাচ্ছি যা কিনা ন্যানো প্রযুক্তির বৈদ্যুতিক সিষ্টেমে বেশ ব্যবহারযোগ্য হতে পারে।

অনাবৃত থাকলে ন্যানোগুচ্ছগুলো পরস্পর জোড়া লেগে যেতে পারে এই আশঙ্কা দূর করতে রাসায়নিক আবরণ ব্যবহারের বিষয়টি আমরা দেখেছি। ন্যানোগুচ্ছগুলোকে পরস্পর আলাদা রাখার কাজটি আরো একভাবে করা যায়। জিওলাইট একটি সছিদ্র বিদ্যুৎ অপরিবাহী বস্তু যার সারা অবয়ব অতি সূক্ষ্ম নলের মত জিনিসে ঝাঁঝরা থাকে। এই জিওলাইটের মধ্যে ধাতব ন্যানোগুচ্ছ সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে এতে গুচ্ছগুলো জিওলাইটের ঐ সরু নলগুলোর মধ্যে থাকে, ও তার দ্বারা আবৃত থাকে। যথেষ্ট পরিমাণ গুচ্ছ এভাবে সেখানে জমলে জিওলাইট জিনিসটিই একটি সেমিকন্ডাক্টরে পরিণত হয়। কারণ তখন ইলেকট্রন ঐ নলের মধ্যে দীর্ঘ তারের আকারে সজ্জিত গুচ্ছগুলোর একটি থেকে অন্যটিতে লাফ দিয়ে গিয়ে কারেন্ট সৃষ্টি করতে পারে।

এভাবে জিওলাইট ঘনসংবদ্ধ অনেকগুলো ন্যানো তারের একটি বান্ডিলের কাজ করতে পারে – বৈদ্যুতিক তারের মতই। এরকম ন্যানো তার ক্ষুদ্র ন্যানো জগতের বৈদ্যুতিক সিস্টেমের জন্য খুবই যথাযথ।

সেমিকন্ডাক্টর বস্তুর ন্যানোগুচ্ছ তৈরি করলে গুচ্ছের আয়তন নিয়ন্ত্রণ করে সেমিকন্ডারটির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সেমিকন্ডাক্টরে ইলেকট্রন শক্তি অবস্থার যে ব্যান্ডগুলো থাকে তাতে প্রায় শূন্য কন্ডাকশন ব্যান্ড আর প্রায় ভর্তি ভ্যালেন্স ব্যান্ডের মধ্যে একটি শক্তি ব্যবধান (ব্যান্ড গ্যাপ) থাকে তা আমরা দেখেছি। এই ব্যবধানের পরিমাণ অনেকাংশেই সেমিকন্ডাক্টরের বৈদ্যুতিক ও আলোক গুণ নির্ভর করে। ন্যানোগুচ্ছ যত ছোট হবে ততই সাধারণ অবস্থায় সেমিকন্ডাক্টরটির ব্যান্ড গ্যাপের তুলনায় গ্যাপটি বড় হবে। যেমন ক্যাডমিয়াম সালফাইড– এই সেমিকন্ডাক্টরের সাধারণ গ্যাপের তুলনায় ন্যানোগুচ্ছ অবস্থায় তার গ্যাপ প্রায় দ্বিগুণ। অনেক রকম ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় এই গ্যাপটির বাড়ানো কমানোটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একই ভাবে ন্যানো-ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে ক্রমাগত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র করাটিই এখন বিজ্ঞানীদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটারের মাইক্রোপ্রসেসর, মেমোরি, ইত্যাদিকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করার মাধ্যমেই এসব প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটেছে। এই ক্ষুদ্রায়ন প্রায় আণবিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে এই ন্যানোগুচ্ছের আকারের সেমিকন্ডাক্টরের কল্যাণে।

কোয়ান্টাম ডট্

ন্যানোগুচ্ছকে আরো একটি চমকপ্রদ ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেটি হলো কোয়ান্টাম ডট্। এই কোয়ান্টাম ডট জিনিসটি হলো একটি থেকে কয়েক হাজারটি ইলেকট্রনকে যদি একটি বিন্দুবৎ অতি ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ করে রাখা হয়, সেই অবস্থাটি। সীমাবদ্ধ পরিসরে আলাদা থাকা পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলো যেমন কতগুলো শক্তি অবস্থায় বিভক্ত থাকে, এক্ষেত্রেও বিন্দুবৎ পরিসরে আটকানো থাকা ইলেকট্রনগুলো একই আচরণ করে। একটি অপরিবাহী অতি ক্ষুদ্র ধারকের মধ্যে সীমিত থাকা ন্যানোগুচ্ছকেও একটি কোয়ান্টাম ডট্ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এরকম পরিস্থিতিতে থাকা ইলেকট্রন একটি পরমাণুর মত যেভাবে বিভিন্ন শক্তি অবস্থায় থাকতে পারে, সেভাবে শক্তি শোষণ করে উচ্চতর অবস্থায় যেতে পারে, আবার ফিরে আসতে পারে – এই প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে এটি একটি ক্ষুদ্র ট্রানজিষ্টরের ভূমিকা অর্থাৎ একটি সুইচের ভূমিকা নিতে পারে। এরকম সুইচই হলো কম্পিউটারের মূল উপাদান– এর প্রসেসরের লজিক গেইটগুলোর এবং এর মেমোরির। সাধারণ ভাবে আজকাল কম্পিউটার চিপে

ক্রমাগত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ট্রানজিষ্টরকে ঠাসবুনোট সমন্বিত করে কম্পিউটারের ক্ষুদ্রায়ন করা হচ্ছে। কোয়ান্টাম ডট্ এই ক্ষুদ্রায়নকে একেবারে ন্যানো পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

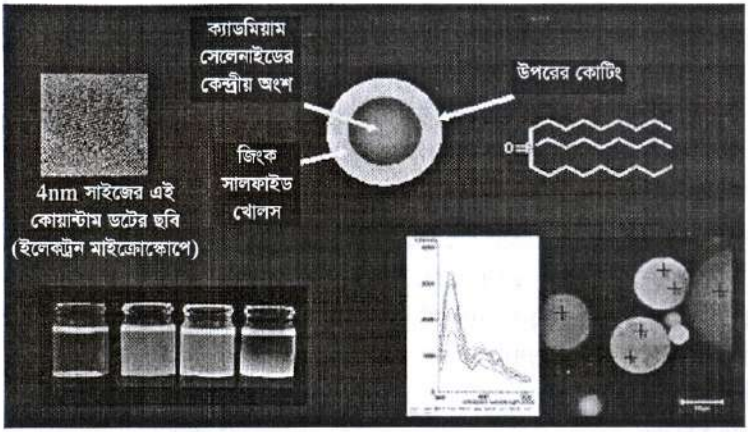

কোয়ান্টাম ডট

শুধু তাই নয় কোয়ান্টাম ডট্ বর্তমান প্রচলিত কম্পিউটেশন ব্যবস্থার পরিবর্তে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ব্যবস্থা এনে দেবে – যা হবে খুব সম্ভব আগামী দিনের কম্পিউটার বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। বর্তমান কম্পিউটিং ব্যবস্থার বাইনারি সিষ্টেমের দুটি চিহ্ন ধরে তা দিয়ে সব তথ্যের প্রতিনিধিত্ব করানো হয়। ট্রানজিষ্টর সুইচিং ব্যবস্থায় হয় অন্ নতুবা অফ্ এই দুটি বিকল্প থেকে বেছে নিয়েই প্রসেসরে তা কার্যকর করা হয়। এভাবে বাইনারি কোডে থাকা তথ্যের মধ্যে ০ অথবা ১ এই দুই চিহ্নের প্রত্যেকটিকে বলা হয় এক একটি বিট।

কোয়ান্টাম কম্পিউটার এক্ষেত্রে কোয়ান্টাম তত্ত্বের কিছু অদ্ভুত নীতির সুযোগ নেবে যা কিনা ইলেকট্রন, পরমাণু ইত্যাদি ক্ষুদ্র কণিকার ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য, সেই সুবাদে কোয়ান্টাম ডটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে বিট হবে কোয়ান্টাম বিট বা সংক্ষেপে– 'কিউবিট'। এর বৈশিষ্ট হলো এতে অন্ এবং অফ্ আলাদা ভাবে থাকা ছাড়াও উভয়েই এক সঙ্গে নানা অবস্থায় থাকার মতো একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বর্তমান কম্পিউটারে যেমন মাত্র দুরকমের বিটের সারিতে তথ্যকে প্রকাশ করা হয়, কোয়ান্টাম কম্পিউটারে কিউবিটের সারিতে অন্ অফের অসংখ্য সম্ভাব্য সমন্বয়ের নানা কিউবিটও স্থান পাবে। এর ফলে তথ্য প্রসেস করার গতি বেড়ে যাবে অনেকখানি; এক সঙ্গে সমান্তরালভাবে অনেক তথ্য প্রসেস করা সম্ভব হবে; এবং মেমোরিতে জমিয়ে রাখা তথ্যের ঘনত্বও হবে অনেক অনেক বেশি।

আরো একটি মৌলিক পরিবর্তন কোয়ন্টাম কম্পিউটারে আসছে। বর্তমান কম্পিউটারে অন্ ও অফ্ ঠিক করা হয় ট্রানজিষ্টর সুইচে কারেন্টের প্রবাহ সৃষ্টি করে বা বন্ধ করে, তা নির্ণয়ও করা হয় কারেন্ট আছে কি নাই তা দেখে। কোয়ান্টাম কম্পিউটারে এ কাজ করা হয় ইলেকট্রনের স্পিন (ঘূর্ণন) অনুযায়ী; দু'রকম স্পিন এর হতে পারে– আপ এবং ডাউন। উদাহরণ স্বরূপ কোয়ান্টাম ডটগুলোর সর্ববহিস্থ শক্তি অবস্থায় যে ইলেকট্রন থাকে বিভিন্ন ডটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের বিশ্লেষণ থেকে ওগুলোর স্পিনের অবস্থা নির্ণয় করা যায়। ভবিষ্যতে একইভাবে স্পিনগুলোকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হবে, যা কম্পিউটেশনের জন্য প্রয়োজন। কোয়ান্টাম তত্ত্বে স্পিনের আপ ও ডাউনের নানা সমন্বয় সম্ভব হয়, এবং তাই কিউবিটের মাধ্যমে কম্পিউটেশনে অনেক দ্রুততা আনা সম্ভব হবে। কোয়ান্টাম ডটের মত জিনিসের কল্যাণে শিগ্‌গির এমন কম্পিউটারই আমাদের হাতে চলে আসবে যার মূল অবয়বটি আণবিক পর্যায়ের আয়তনের– ফলে কম্পিউটার হবে অনেক ক্ষুদ্র অথচ খুবই শক্তিশালী। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য ধূলির মত অসংখ্য ক্ষুদ্র কম্পিউটার গবেষণার স্থানে ছড়িয়ে দেয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যাবেনা; আবহাওয়ার জরিপের জন্য যেমন তা সুবিধাজনক হবে তেমনি গুপ্তচরের কাজের জন্যও হবে। সেগুলোর প্রত্যেকটি নিজে যেমন তথ্য সংগ্রহ ও প্রসেস করবে তেমনি পরস্পরের সঙ্গে ও কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

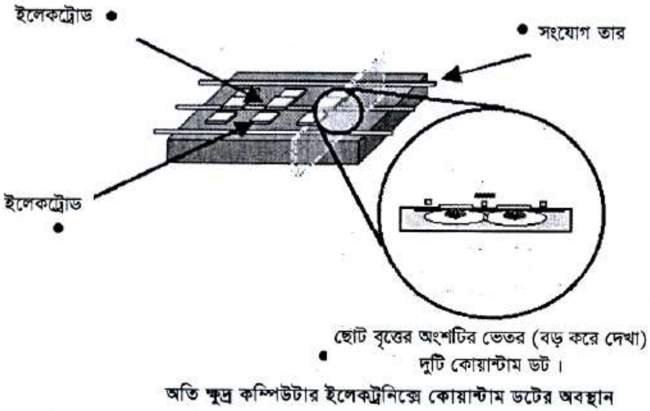

অতি ক্ষুদ্র কম্পিউটার ইলেকট্রনিক্সে কোয়ান্টাম ডটের অবস্থান

কোয়ান্টাম ডটের ফলে ভবিষ্যতে অপটিক্যাল কম্পিউটার প্রচলনের সুযোগও দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপটিক্যাল কম্পিউটারে ডিজিট্যাল তথ্যকে লেজার

আলোর পাল্‌স রূপে এনে তা অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে প্রসেসিং করা হয়। সাম্প্রতিক ন্যানোগুচ্ছ প্রযুক্তি এমন অতি ক্ষুদ্র ও দক্ষ কোয়ান্টাম ডট সৃষ্টি করতে পারছে যার থেকে খুবই সামান্য পাওয়ারে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির লেজার পাল্‌স সৃষ্টি সম্ভব। গুচ্ছের আয়তনের উপর ব্যান্ড গ্যাপ নির্ভর করে আর লেজারের প্রকৃতিও নির্ভর করে সেই ব্যান্ড গ্যাপের উপর ; তাই গুচ্ছ তৈরির প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ এনে লেজারকে সূক্ষ্মভাবে টিউন করার রাস্তা খুলে যাচ্ছে। ন্যানো গুচ্ছের রসায়ন, কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক নূতন সুযোগ ও ন্যানোপ্রযুক্তির সমন্বয়ে অদূর ভবিষ্যতে অতি-শক্তিশালী কম্পিউটেশন; এবং বৈদ্যুতিক, আলোক ও চৌম্বক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্রায়িত একটি নূতন বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে যে আমরা আছি তা একেবারেই নিশ্চিত।

ফুলারিন ও ন্যানোটিউব

ন্যানো প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাস্তবিক যে ক্ষেত্রে আমরা সব চেয়ে বেশি এগিয়ে গিয়েছি তা হলো কার্বন পরমাণুতে গড়া কিছু ন্যানোগুচ্ছ – ন্যানো সাইজের ফুটবলের আকৃতির অথবা নলাকৃতির। আশির দশকের মাঝামাঝি ৬০ টি কার্বন পরমাণু ঐ ফুটবল আকৃতিতে সবদিক থেকে নিঁখুত প্রতিসাম্যে সাজানো গোলক C_{60} প্রথম আবিষ্কৃত হয়। কার্বনের একটি রূপ কঠিন গ্রাফাইটকে লেজারের সাহায্যে বাষ্পীভূত করলে তাতে পাওয়া গুচ্ছগুলোতে পরমাণু সংখ্যায় যথেষ্ট বৈচিত্র থাকে বটে, কিন্তু ম্যাস স্পেকটোগ্রাফি পরীক্ষায় দেখা গেছে কতগুলো বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় (তথাকথিত ম্যাজিক নাম্বার) পরমাণু নিয়ে গুচ্ছের সংখ্যা বেশি। তার মধ্যে সব চেয়ে বেশি সংখ্যায় থাকে ৬০ টি কার্বন পরমাণুর গুচ্ছ C_{60}। শিগ্‌গির এর গঠন নির্ণয় করে দেখা গেল কার্বন পরমাণুগুলো এতে পরস্পর বন্ধনে ২০টি ষড়ভূজ ও ১২টি পঞ্চভূজের সুন্দর সমন্বয়ে একটি গোলকাকার খাঁচার আকৃতিতে রয়েছে– একটি ফুটবলে চামড়ার ষড়ভূজ ও পঞ্চভূজ টুকরাগুলো যেভাবে সেলাই

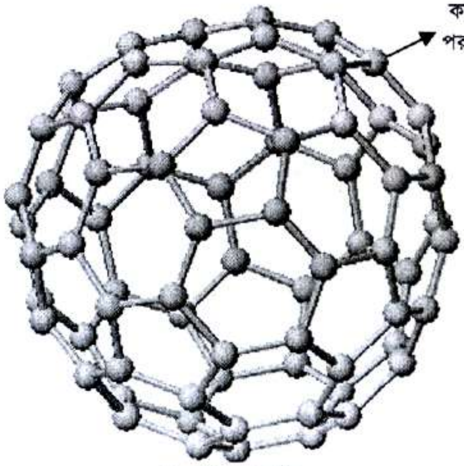

ফুলারিনের গঠন

হয়ে গোলক গড়ে, অনেকটা অবিকল সেভাবে। ১৯৯৬ এর মধ্যে আরো উন্নত উপায়ে যথেষ্ট পরিমাণ C_{60} তৈরির উপায় উদ্ভাবিত হয় এবং এটি কার্বনের একটি নূতন অনন্য গঠন বলে চূড়ান্ত স্বীকৃতি পায়। এর নাম দেয়া হলো বাকমিনিষ্টার ফুলারিন, সংক্ষেপে ফুলারিন, ডাক নামে বাকি-বল। পরে C_{70} সহ অনুরূপ আরো কিছু এরকম গোলকাকার কার্বন ন্যানোগুচ্ছকে এক সঙ্গে সাধারণভাবেও ফুলারিন বলা হয়। এই ফুলারিনগুলোকে কেন্দ্র করে ন্যানোগুচ্ছের একটি নূতন ধরনের রসায়নের সূত্রপাত হয়েছে যার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সম্ভাবনা অনেক।

তবে ফুলারিনের ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানীরা যে কার্বন ন্যানো টিউব সৃষ্টি করেছেন তার সম্ভাবনা আরো অধিক বিস্তৃত। এতে কার্বন পরমাণু তৈরি এক ধরনের জালি রোল করার মত জোড়ানো অবস্থায় একের ভেতর আরেক নলের সমন্বয়ে ন্যানো টিউব সৃষ্টি হয় যার মাঝখানটি ফাঁকা। এর জালির মত দেয়ালকে গ্রাফীন শীট বলা হয়, বর্তমানে সমতল শীট হিসেবে তারও প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ন্যানো টিউবগুলো ১০০ ন্যানোমিটার থেকে কয়েক হাজার ন্যানোমিটার পর্যন্ত লম্বা আর ১ থেকে ২০ ন্যানোমিটার ব্যাসের হতে পারে। ন্যানো টিউবের নিজস্ব গুণাগুণ তো রয়েছেই, আরও বড় কথা হলো এর মাঝের ফাঁকা জায়গায় অন্য যে কোন তরল অবস্থার দ্রব্য ঢুকানো সম্ভব– তা গলিত ধাতু, ধাতব অক্সাইড, অন্য যে কোন যৌগ বা মৌল হতে পারে। অনেক তরলের ক্ষেত্রে অতি সরু এই নলের কৈশিকতার গুণের ফলে তরলটি আপনা-আপনিই এর ভেতর উঠে আসে– যেমন করে কোল্ড ড্রিংক পান করার নল ডুবালে তরল আপনা-আপনি কিছুটা উঠে আসে। এভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের অতি সরু অবয়ব তৈরির ফলে তাতে অভ্যন্তরের তুলনায় পৃষ্ঠদেশের আয়তনের প্রাধান্য ঘটিয়ে নানা নূতন নূতন গুণের সূচনা করা যায়।

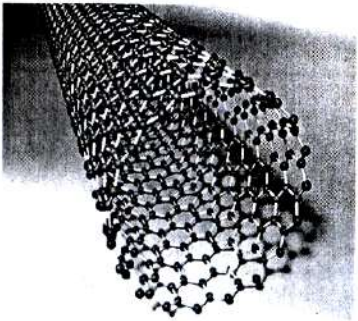

কার্বন ন্যানো টিউব

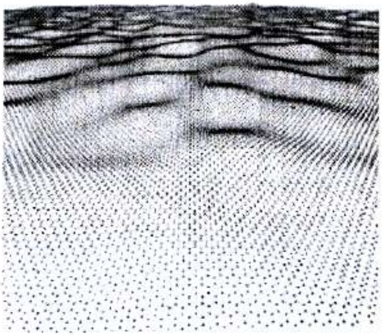

গ্রাফীন শীট

তাছাড়া কার্বন ন্যানো টিউব নিজেও একাই একশ' – নানা গুণের দিক থেকে। এর টানের পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা ইস্পাতের চেয়ে ৫০ থেকে ১০০ গুণ বেশি। এর বিদ্যুৎ পরিবাহিতার গুণ তামার মতই ভাল। আবার এর মধ্যে উপযুক্ত অন্য বস্তু ঢুকিয়ে একে প্রয়োজন মত পি-টাইপ বা এন-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে পরিণত করা যায়– আর এর সবই হচ্ছে ক্ষুদ্র ন্যানো পরিসরে।

কার্বন ন্যানো টিউবের প্রয়োগ দুই প্রধান দিক থেকে আসছে – একটি হলো অত্যন্ত শক্ত দ্রব্যাদি তৈরিতে, অন্যটি হলো ইলেকট্রিক্যাল ও অতি ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে। প্রথম প্রকারের প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত শক্ত ওয়াটারপ্রুফ এবং টেকসই পোষাক, বুলেটপ্রুফ পোষাক, কংক্রীট, ক্রীড়া সরঞ্জাম, অত্যন্ত শক্ত ফাইবার, সেতু, স্প্রিং ইত্যাদি। এর দ্বারা নির্মিত রজ্জু এতই শক্ত হবে যে পৃথিবী থেকে মহাশূন্য হয়ে কোন কৃত্রিম উপগ্রহ পর্যন্ত স্থাপিত যে রজ্জু-পথের কথা কল্পনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে লিফ্‌টে চড়েই মহাশূন্যে যাওয়া ভবিষ্যতে সম্ভব হতে পারে, এই কার্বন ন্যানো টিউব দিয়েই তা তৈরির কথা ভাবা হয়েছে। এরকম অকল্পনীয় রকমের দীর্ঘ রজ্জুর নিজের ওজনই এত হবে যে তা নিজেই বহন করতে সক্ষম হবে একমাত্র এই ন্যানো টিউব দিয়ে তৈরি রজ্জুই। ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে হীট সিঙ্ক, অতি পাতলা আলোক উৎস, অতি পাতলা ডিসপ্লে ইত্যাদি; ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ, ন্যানো তার, ন্যানো পর্যায়ের পাতলা পরিবাহী পর্দা, ঘর্ষণে ক্ষয় পাবেনা এমন টেকসই মোটরের বৈদ্যুতিক সংযোগ (ব্রাশ), সৌরকোষ, সাধারণ উত্তাপে অতিপরিবাহী বস্তু, এর অতি পাতলা অবয়বের সুযোগ নিয়ে বিশাল ধারকত্বের সুপার ক্যাপাসিটর, অতি উচ্চ চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরির ব্যবস্থা, ইত্যাদি। সবচেয়ে আশার কথা হলো এর মধ্যে অনেকগুলো প্রয়োগের প্রাথমিক সাফল্য ইতোমধ্যেই এসেছে।

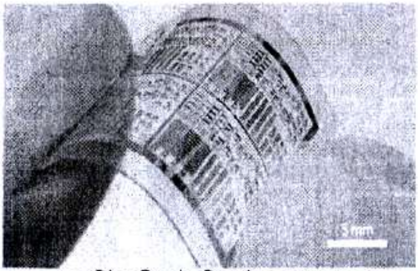

ন্যানোটিউব দিয়ে তৈরি ছোট বস্তুখণ্ডে অনেক কম্পিউটারের ইলেকট্রনিক্স

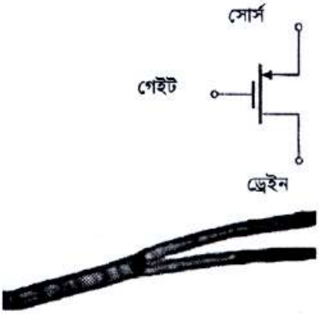

Y অক্ষরের আকৃতির একটি মাত্র ন্যানো টিউব থেকে ন্যানো আয়তনের ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিষ্টর

ফুলারিন ও ন্যানো টিউব উভয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগের আর একটি দিক হলো নানা রকম রাসায়নিক গ্রুপকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করে, বা এর মাঝখানের খাঁচায় আটকিয়ে, নূতন নূতন রাসায়নিক গুণের সৃষ্টি। রাসায়নিক গ্রুপকে এরকম ক্ষুদ্র অবয়বে সীমাবদ্ধ করাতে তারা অধিক পৃষ্ঠদেশ বিস্তার করে ক্যাটালিষ্টের মত কাজ অধিক দক্ষতায় করতে পারে। তাছাড়া ফুলারিনের খাঁচায় তেজস্ক্রিয় গ্যাস রেডনকে আটকিয়ে তাকে এক ধরনের প্যাকটে বন্দী অতি ক্ষুদ্র কণা হিসেবে নানা দূষণ বস্তু ইত্যাদিতে মিশিয়ে দেয়া যায়। ঐ বন্দী রেডনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি উদ্ঘাটন করে কোথাও অল্প পরিমাণে এই দূষণ বস্তু গেলে তাও ধরা পড়তে পারবে। একই ভাবে প্যাকেটবন্দী ক্যান্সার ওষুধের সঙ্গে ক্যান্সার কোষকে খুঁজে নেয় এমন এন্টিবডি সংযুক্ত করে তাকে দেহে ঢুকালে নিরাপদে সেটি সোজা শুধু ক্যানসার কোষে গিয়ে কাজ করবে। এসব ক্ষেত্রে ফুলারিনের খাঁচার মধ্যে ক্ষুদ্রাকারে প্যাকেটবন্দী করে দেয়াটাই হলো বড় সুযোগ। কারণ ফুলারিন ভেতরের জিনিসটিকে (তেজস্ক্রিয় পদার্থ, ক্যানসার ওষুধ ইত্যাদি) অন্য কিছুর সঙ্গে বা অন্য দেহ কোষের সঙ্গে বিক্রিয়া করা থেকে বিরত রাখে।

পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। বিজ্ঞান লেখক। অর্ধশতাব্দী ধরে প্রকাশিত মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের (সিএমইএস) প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার। বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বিভিন্ন স্বীকৃতি প্রাপ্ত লেখক।